এক দেশ
এক সংবিধান

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক
৬ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা - ৭৩ থেকে প্রকাশিত

মহালয়া - ২০১৯

মুদ্রক ঃ ইন্টারন্যাশানাল প্রিন্টাস্
৬০ হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

‘এক দেশ মে দো বিধান
দো নিশান দো প্রধান নহি চলেগা।’

- ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ এর প্রত্যাহার নিয়ে বক্তব্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমার জীবনকালে এই দিনটি দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

-সুষমা স্বরাজ

অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং অনুচ্ছেদ ৩৫এ এর অন্তর্গত আইনে জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ স্থান প্রদান করার ঐতিহাসিক ভুলের জন্য দেশকে রাজনৈতিক এবং আর্থিক দুই ভাবেই ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। আজ যখন ইতিহাসকে নতুন রূপে লেখা হচ্ছে তখন এটা প্রমানিত যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ছিল এবং পন্ডিতজির নীতি বিফল হয়েছে।

-অরুন জেটলি

সম্পাদকের কলমে

একটা রাষ্ট্রের ইতিহাসে খুব কম মুহূর্তই এমন আসে যখন একটা বড় সিদ্ধান্তের দ্বারা তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এরকম সিদ্ধান্তের দ্বারা ইতিহাসের পথ ঘুরে যায় এবং রাষ্টের যাত্রা এক নতুন শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। এতে ভবিষ্যতের প্রতি এমন এক আশা এবং বিশ্বাসের সঞ্চার হয় যেখানে অনেক সাফল্যের এবং উপলব্ধির লোকগাথা লেখা হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই যখন এরকম বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন তার প্রভাব গোটা দেশের মানুষের ওপর পড়ে। পুরো দেশ এর প্রভাবে যেন বসন্তের নতুন মঞ্জরীতে পল্লবিত হয়ে ওঠে। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর বিলোপ এবং জম্মু-কাশ্মীরের পুনর্গঠন ভারতের ইতিহাসে এরকমই একটি বড় সিদ্ধান্ত। এরকম নির্ণয়ের জন্য রাষ্ট্রের আপামর মানুষ অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যেভাবে রাজনৈতিক পরিবেশের ঋণাত্মকতা গোটা দেশকে গ্রাস করছিল সেখানে এটা কঠিনই নয় , প্রায় অসম্ভব ছিল। এরকম ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য দরকার ছিল খুব দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি। এমন এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল যা আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং দৃঢ়। যখনই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং যে মুহূর্তে সংসদ এর ওপর আলোচনা করে একে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দুটো কক্ষেই পাস করল, তখন রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষ একজোট হয়ে মেতে উঠলো অকাল দীপাবলিতে। উৎসবের আবহে সেজে উঠলো গুজরাট থেকে অরুণাচল, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। ইতিহাসের পাতায় এই মুহূর্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রইলো।

জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতে সংযুক্ত করার পথ ৩৭০ ধারা দ্বারা কিভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে এর ওপর শুরু থেকেই সন্দেহ ছিল। যদিও বা সংবিধানে একে অস্থায়ী আইন হিসেবে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ভ্রমের বশে একে একটা অপ্রোজনীয় স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হচ্ছিল দশকের পর দশক। যে কারণে দেশের প্রগতি এবং বিকাশ দুইই বাধা পাচ্ছিল। কয়েক দশকের রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে এর জন্য রাজ্যকে দেশের অন্তর্ভুক্ত করতেই কেবলমাত্র বাধা সৃষ্টি হয়নি, সন্ত্রাসবাদী গতিবিধি বাড়াতেও এই ধারা আগুনের মত কাজ করছিল। এতে বাকি ভারতের তুলনায় জম্মু-কাশ্মীর উন্নতির দৌড়ে দিনে দিনে পিছিয়ে পড়েছিল। সাত দশকের থেকেও বেশি সময় পর্যন্ত এটা থাকার জন্য সমস্যা আরো বড় হয়ে যায়। এই সময়কালের মধ্যে সেখানে সাধারন মানুষকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় এবং প্রায় ৪১, ৮৪৯ মানুষকে সন্ত্রাসবাদীদের হিংসায় নিজেদের প্রাণ হারাতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এটাই যে এই ধারাকে সমর্থনকারীদের একটা অংশ এখনও ৩৭০ এবং ৩৫এ সমাপ্তির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করতে পারেনি। এই স্বার্থান্বেষী অংশ এমনভাবে প্রচার করছে যে মনে হয় সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে - গণতন্ত্র থেকে সংবিধান পর্যন্ত, সব। আজ ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বাস্তবিকতা স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত নয়। এর প্রতি ওদের যুক্তিহীন মোহ কোন বিকল্প মতবাদের জন্যেও তৈরি নয়। যারা মোদী সরকারের জম্মু-কাশ্মীরের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করছেন তারা নিঃসন্দেহে অতীতের হীনমন্যতার শিকার।

ধারা ৩৭০ এর সমর্থনকারীদের প্রধান যুক্তি জম্মু-কাশ্মীর নিজের বিশেষ ইতিহাসের কারণে সংবিধানে বিশেষ রাজ্যের স্থান পাবার অধিকারী। কিন্তু এরকম যারা বলে তারা ভুলে যায় যে ভারত মস্ত বড় এক দেশ। তাই হাজারো বিবিধতা নিজের মধ্যে সমাহিত করেই তার অতীত থেকে ভবিষ্যৎ কাটে। দেশের প্রতিটা প্রান্তেরই নিজের একটা ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে জম্মু-কাশ্মীরের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে যেমন অন্য প্রান্তগুলিরও নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে যা তাদের বিশেষ মর্যাদা দেয়। আমাদের এটা ভোলা উচিত নয় যে বিশিষ্টতার ঐতিহ্য একা একা আসে না। বরং পারিপার্শকিতার সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য কাউকে বিশেষ বানায়। এবং এই বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীর কোন ব্যতিক্রম নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাশ্মীরিয়ত্কে আজ সাংস্কৃতিক ঘটনা রূপে দেখানো হচ্ছে। এমনভাবে প্রচার চলছে যেন আজ এর উপর বিপদের মেঘ ঘুরছে এবং এর অস্তিত্বকে বাঁচানোর জন্য আইনত সংরক্ষণ প্রয়োজন। কাশ্মীরিয়ত্ের বিষয় কেবলমাত্র একটি বিশেষ ঘটনা রূপে দেখানো হচ্ছে না, এটা করে জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখ অংশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেও ছোট করা হচ্ছে। কাশ্মীরিয়ত্ যদি ধারণাগত ভাবে এই পুরো প্রান্তের অন্তর্ভুক্তিমূলক আবেদনসহ একটি ভাবনাগত বাধ্যবাধকতার শক্তি হয়, তবে কেন এটি ভারতের সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হতে পারে না? বাস্তবে বিশেষ মর্যাদার দাবি করা মানুষগুলোর নিজেদেরই এটা বিশ্বাস হয়না যে কাশ্মীরিয়ত্ একটি সমাবেশী সংস্কৃতি। পাশাপাশি সচেতনভাবেই তারা একে এক বিশেষ এবং উপত্যকা-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি বলে প্রচার করে। কারণ সংরক্ষণের নীতিকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া তাদের কাছে টিকে থাকার আর কোন বিকল্প রাস্তা নেই।

ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর বিষয়ে ক্রমাগত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা কাশ্মীরি মানুষদের অনেক ক্ষতি করা হয়েছে। এই আইন কেবল তাদের অপূরণীয় ক্ষতিই করেনি জাতীয়তাবাদ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের মানসিক পরিবর্তনও এনেছে। এবং অবশ্যই তাদের ভারতের অংশ হবার ভাবনার সাথে খেলা করেছে। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর সমর্থনকারীরা

বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার শিকার। তারা জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের ভারতীয় মানতে তৈরি নয় এবং তাদের কেবল ভর্তুকি এবং সরকারি সুবিধার মাধ্যমে ভারতের অংশ করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। তারা এটা কল্পনাও করতে পারে না যে কাশ্মীর পুরোপুরি ভারতে মিলিয়ে যেতে পারে এবং যদি এই ধরনের একত্রীকরণের চেষ্টা করা হয়, তবে তাতে তারা ভারতেরই ক্ষতি দেখতে পায়।

কি অদ্ভুত, অযৌক্তিক এবং বিভ্রান্তিমূলক ভাবনা! এই ভাবনাই কাশ্মীরি মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে ভয়ের পরিবেশে। এটা কেবলমাত্র একটা ভয় নয়। বরং কাশ্মীরের লোকেদের, এবং বলা যেতে পারে যে পুরো ভারতের একটা অংশের উপর বড় অবিশ্বাস করে দেশকে অনিশ্চয়তায় মুড়ে দিতে চাইছে ওরা। এটা বাস্তবে ওইসব লোকেদের সাথে একটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা যাদের হিতের কথা এরা চিন্তা করে বলে প্রচার করে। এরা মনে করে যে ভারতের অন্য জায়গার বিপরীতে কাশ্মীর ভারতীয় সর্বভৌমত্বের বাইরে এবং এই অংশে ভারতীয় আইন ধার্য করার ফলে দেশজুড়ে উথাল-পাতাল হতে পারে। এইসব ধারণার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রকে সন্দেহ করা এবং লোকেদের একটা অংশের সামনে ভুল ছবি প্রস্তুত করা।

দেশে বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ এমন আছে যা সংসদ এবং আইন বানানোর অধিকারকেও গণতন্ত্রের নামে চ্যালেঞ্জ করতে ছাড়ে না। এরকমই কিছু প্রশ্ন ওই সময় তোলা হয় যখন সংসদ সংবিধানে সম্পর্কিত সংশোধন করে ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর কিছু অংশ সরানোর জন্য প্রস্তাব করে এবং জম্মু-কাশ্মীর কে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুনর্গঠিত করে। মারাত্মক ক্ষতিকর মানসিকতার সাথে এই যুক্তি বহুবার দেওয়া যায় যে গণতান্ত্রিক মানদন্ডগুলির মানুষের সাথে সরাসরি সংযোগের প্রয়োজনীয়তা থাকে। আসলে মানুষের সাথে সংযোগের ধারণাই একটি অপরিষ্কার ব্যাপার। কারণ প্রথমত "গণ" শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত "সরাসরি সংযোগ" বলতে কী বোঝানো হয় সেটিও অজ্ঞাত। এই ধরণের উৎকৃষ্ট বিচারের অস্পষ্টতার কারণে সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়াতে বরাবর দেরি হয় আর যে কোন ধরনের গঠনমূলক কাজকে কলঙ্কিত করা হয়। পাশাপাশি সমাধানের কথা বলা লোকদের যে কোনো রকমের চেষ্টায় ক্ষতি করার মানসিকতাও এই বিকৃত ভাবনার ফসল। এছাড়া বাকস্বাধীনতার নামে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে একটি নির্বাচিত সরকারের অধিকারের ওপর প্রশ্ন তোলা হয়। গণতন্ত্রের নামে সংসদের অধিকারের উপরেও প্রশ্ন তোলা হয়। সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এমনকি আইন বজায় রাখার বিচারব্যবস্থাগুলিকেও ক্রমাগত টার্গেট করা হয়।

এইসব তথাকথিত "গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী"রা আসলে কোনো কিছুরই মানদন্ড জানে না। সাংবিধানিক এবং আইনি আদর্শের পালন করেনা। কোন নৈতিক বা সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে না। এবং এই সব কুকর্ম চালিয়ে যায় গণতন্ত্রের নামে। আবারও একথার পুনরাবৃত্তি করা উচিত যে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সাংসদরা সংসদে গণতন্ত্র, মানদণ্ড এবং সাংবিধানিক গঠনতন্ত্রের ভেতর কাজ করে। একে কিছু সামাজিক ও মানবিক আইনের মাধ্যমে বৈধতা প্রদান করা হয়। এটা মনে রাখা দরকার যে গণতন্ত্রকে সরাসরি সমস্ত জনতা কর্তৃক শাসনের মাধ্যমে চালানোর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না - সেটা সম্ভবও নয়। ভারতের মানুষের ইচ্ছাগুলির পালন সংসদ এবং নির্বাচিত সরকার করবে। জাতির সঠিক পথের দিশা কিছু অগণতান্ত্রিক লোক নির্ণয় করবে না।

আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে তর্ক এবং বিতর্ককে জীবন রেখা মানা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ভারতীয় সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাংবিধানিক-রাজনৈতিক নৈতিকতার শপথ করে তারাই ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর অত্যন্ত বৈষম্যমূলক এবং অস্থায়ী বিধানগুলির সমর্থন করে। লাদাখ এবং জম্মু অঞ্চলের দুর্দশা, আদিবাসী, মহিলা এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থীদেরকে তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, সমাজের বিভিন্ন বর্গকে সাধারণ মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা রাজ্যের একটা বড় শ্রেণীর ওপর যারপরনাই অন্যায় হবে। একবার যদি আমরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সাথে হওয়া দুর্দশার কথা কিছু সময়ের জন্য ছেড়েও দিই তাও উদারবাদের তথাকথিত সমর্থকেরা সার্বজনিক স্তরে এই অত্যধিক বিভেদপূর্ণ অমানবিক নিয়মগুলির ওপর প্রশ্ন তুলতে ব্যর্থ হয়। এই দুর্বৃত্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে নিজেদের আওয়াজ ওঠানোর জায়গায় তারা কেবল কাশ্মীরে সামরিক দখল আখ্যানের মিথ্যা প্রচারই করে যায়।

ওরা এটাও দাবি করছে যে ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ র বিলোপ রাজ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেষ করার একটা প্রচেষ্টা। ওদের কাছে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র একটি হাস্যকর বস্তু। বাস্তবে ভারতে কোন মুসলিম রাজ্য বা হিন্দু রাজ্য নেই, যা আছে সবই ধর্মনিরপেক্ষ প্রদেশ। এটি আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনার উপর একটি প্রত্যক্ষ হামলা। যদি এরকমই মতবাদ দেওয়া চলতে থাকে তবে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এক বিকৃত সংস্করণ সামনে আসবে এবং যা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উপর সরাসরি আঘাত বলেই বিবেচিত হবে।

সাম্প্রদায়িক চশমা দিয়ে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫ এ এর বিলোপের সিদ্ধান্তকে দেখা একটা বড় ভুল। এই সিদ্ধান্তের কারণ এবং তার বিস্তার বহুমাত্রিক। একসঙ্গে অনেক মানুষের হিতসাধন এই সিদ্ধান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। লাদাখের আপামর জনগণ আজ এই সিদ্ধান্তের পক্ষে। এটা থেকেই পরিষ্কার যে ভারতীয় সংবিধানে সার্বভৌমত্বের ধারণা যথেষ্ট মজবুত। আজ যদি এই সিদ্ধান্ত জম্মু-কাশ্মীরের মহিলা, আদিবাসী, শরণার্থী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে

পারে তবে নিশ্চিত করে বলা যায় যে ওই অঞ্চলের সাংবিধানিক অধিকার এই সিদ্ধান্তের ফলে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকবে। এটা নিশ্চিত যে এই সিদ্ধান্তের ফলে ওই অঞ্চলে এখন সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক নৈতিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে জনসাধারণকে তাদের সাংবিধানিক অধিকারের সবটুকু নির্যাস পেতে কষ্ট করতে হবে না। খুব স্বাভাবিকভাবে একশ্রেণীর মানুষ, যারা কিনা পরিবার তন্ত্র এবং স্বার্থবাদী লাভ-ক্ষতির বেশি কিছু ভাবতে পারে না, এই সিদ্ধান্তের ক্ষতিকর দিক নিয়ে নোংরা প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বাস্তবে তাদের সাথে আপামর জনগণের বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই এবং তারা জানে না জম্মু-কাশ্মীরের জনতা আসলে কি চায়। এক দুর্বল এবং সিদ্ধান্তহীন মনোভাব এই অংশের মানুষের প্রভূত ক্ষতি আগেই করে রেখেছিল। আজ প্রথমবার এক শক্তিশালী সরকার দৃঢ়সংকল্প হয়ে এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধান করতে এমন এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা এই অঞ্চলে সদ্ভাব, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং উন্নয়নে সহায়ক হবে।

একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ এর বিলুপ্তি এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের পুনর্গঠন এর ব্যাপারে এক শক্তিশালী জনমত আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। সম্ভবত এই ব্যাপক জনসমর্থনের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল ভারতীয় সংসদ যেখানে লোকসভায় তিন-চতুর্থাংশ এবং রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ এই বিলের পক্ষে দাঁড়ান। শাসক দলের সাংসদরা ছাড়াও আরো অনেকে এই বিলের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন বস্তুত এই ব্যাপক জনসমর্থনের বহর দেখেই। আর এখানেই এক ঐতিহাসিক ভুল করে বসেছে কংগ্রেস এবং তার সহযোগী দলেরা। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস শুধু জাতীয় ভাবনার বিপক্ষেই যায়নি বরং জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করে দেশকে এবং সাথে সাথে জম্মু-কাশ্মীরকে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। ভারতবাসী এই ভুলের জন্য কোনোদিন ওদের ক্ষমা করবে না।

অপরিসীম রাজনৈতিক দৃঢ়তার সাথে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এমন এক নির্ভীক এবং মজবুত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাকে কিছুদিন আগেও অসম্ভব বলে মনে করা হতো। রাষ্ট্র তাই আজ প্রধানমন্ত্রীর সাথে। পাশাপাশি তাঁর সহযোগী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ যে অদম্য মনোভাবের সাথে অকাট্য যুক্তি দিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে এই বিলটি পেশ করেছেন এবং বিরোধী পক্ষ থেকে উঠে আসা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন দেশ তাকে কুর্নিশ করে। এই সিদ্ধান্ত জম্মু-কাশ্মীরের সামনে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এখন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা জম্মু-কাশ্মীরকে অবশিষ্ট ভারতের সাথে প্রগতি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া থেকে আটকাতে পারে। অবশ্যই জম্মু এবং কাশ্মীরের সাথে সাথে লাদাখের মানুষেরাও এই সিদ্ধান্তের ফলে নানা ভাবে উপকৃত হবেন। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির এই সিদ্ধান্তের ফলে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ অঞ্চলের মানুষেরা যেভাবে উপকৃত হবেন সম্ভবত তারা তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। উন্নয়ন, প্রগতি এবং শান্তির এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে এই অঞ্চলে।

এই পুস্তিকা দশকের পর দশক ধরে ধারা ৩৭০ এর সাথে জুড়ে থাকা কিছু বিশেষ অংশ, তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা, রাজনৈতিক দস্তাবেজ, আর্টিকেল এবং ভাষণকে দুই মলাটের মধ্যে আবদ্ধ করার এক ছোট্ট প্রয়াস। এই পুস্তিকা পড়লে পাঠক জানতে পারবে কিভাবে দল এবং রাজনৈতিক আদর্শের উপরে উঠে ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতারা অনুচ্ছেদ ৩৭০ কে শেষ করার দাবি জানিয়ে আসছিল বছরের পর বছর। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী থেকে শুরু করে অন্য আরও অনেক নেতা, যারা "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত" এর স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা চেয়েছিলেন এই ধারার বিলুপ্তি হোক। তারা চেয়েছিলেন এক সমৃদ্ধ ভারত, এক উন্নত ভারত এবং এক প্রগতিশীল ভারত। এই পুস্তিকা মূলত তাঁদের কথাই বলবে।

এই পুস্তিকা অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ এর বিলোপকে এক বাস্তবিক পরিসর থেকে দেখার চেষ্টা করে। পাশাপাশি এর উদ্দেশ্য পাঠকের মন এবং মস্তিষ্কে এই বিষয়ে আগামী দিনে আরও পড়াশোনার আগ্রহ তৈরি করা। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের টিম খুব কম সময়ে ব্যাপক পরিশ্রম করে এই পুস্তিকা তৈরি করেছে শুধুমাত্র ধারা ৩৭০ বিলোপের তাগিদে ডক্টর মুখার্জীর আত্মবলিদান কে স্মরণ করে। এই পুস্তিকা সেই মহান ত্যাগের উদ্দেশ্যেই সমর্পিত।

প্রকাশক
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৯, অশোক রোড, নিউ দিল্লি — ১১০০০১

সূচিপত্র
প্রস্তাবনা

পর্ব-১

১. সেই মহানুভব ব্যক্তিদের বক্তব্য যারা ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ বিলুপ্ত করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১.১ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ।

১.২ রাজ্যসভায় স্বরাষ্টমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের দ্বারা জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলের ওপর আলোচনার সময় দেওয়া উত্তরের প্রধান অংশ।

১.৩ লোকসভায় জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলের ওপর আলোচনার সময় স্বরাষ্টমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া উত্তরের কিছু প্রধান অংশ।

পর্ব- ২

২. ধারা ৩৭০ এবং আমাদের স্বনামধন্য নেতারা।

২.১ লোকসভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীঃ বিষয় জম্মু ও কাশ্মীর।

২.২ জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব, ০৭ আগস্ট ১৯৫২।

২.৩ রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে হস্তক্ষেপ।

২.৪ জম্মুর পরিস্থিতির ওপর আলোচনায় হস্তক্ষেপ।

২.৫ জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং রিপোর্ট।

২.৬ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী: কাশ্মীর এবং এর ভবিষ্যৎ।

২.৭ ধারা ৩৭০ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঐতিহাসিক ভাষণের কিছু অংশ।

পর্ব - ৩

৩. ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা।

৩.১ ১৯৬৪ সালে ঐতিহাসিক ৩৭০ ধারা সংক্রান্ত সংশোধনীর উপর বিতর্ক।

৩.২ জম্মু-কাশ্মীর এবং আর্টিকেল ৩৭০ সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর।

পর্ব - ৪

অখন্ড ভারতের সংকল্প ঃ-

৪.১ জনসংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্যের কিছু মুখ্য অংশ।

৪.২ কাশ্মীর সংক্রান্ত জনসংঘের ঘোষণাপত্র।

৪.৩ বিজেপির নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের কিছু অংশ।

পর্ব - ৫

৫. ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিখ্যাত লেখকদের বক্তব্য ও প্রবন্ধসমূহ।

৫.১ অসম্ভবকে সম্ভব করলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

৫.২ ধারা ৩৭০: শঙ্কামুক্তি।

৫.৩ একতার পথে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ।

৫.৪ মুক্তি: ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকের উপর চাপানো বোঝা ছিল, আর কিছু নয়।

৫.৫ লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার মর্মার্থ।

৫.৬ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং আর্টিকেল ৩৭০।

পর্ব - ৬

৬. কিছু বিশেষ অংশ।

৬.১ হাসরাত মোহানীর বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি।

পর্ব- ১

সেই মহানুভব ব্যক্তিদের বক্তব্য যারা ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ বিলুপ্ত করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ পুনর্গঠন সংক্রান্ত এক ঐতিহাসিক বিল সংসদে পাশ করে দেশকে একসূত্রে বাঁধার কাজ করেছেন। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বক্তব্য ছিল আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক। আটই আগস্ট, ২০১৯ সালে এই ঐতিহাসিক বিল পাস হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এখানে আমরা সেই ভাষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখব।

১.১ আটই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের কিছু বিশেষ অংশ

একটি রাষ্ট্ররূপে, একটি পরিবাররূপে, আপনি, আমি এবং পুরো দেশ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটা ব্যবস্থা, যার ফলে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের অধিবাসী আমাদের ভাই-বোনেরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং যে ব্যবস্থা তাদের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তা আজ দূর করা গেছে। যে স্বপ্ন সর্দার প্যাটেল দেখতেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর দেখেছিলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দেখেছিলেন এবং অটলজির সাথে কোটি কোটি ভারতবাসী দেখেছিল তা আজ পূর্ণ হয়েছে।

সমাজ জীবনের কিছু ভাবনা সময়ের সাথে চলতে চলতে অবচেতন মানসিকতায় এমন ভাবে মিশে যায় যে মনে হয় সেগুলিই চিরন্তন। মনে হয় এমনটাই চলবে - কিছুই বদলাবে না। ধারা ৩৭০এর সাথে ঠিক এমনটাই হয়েছিল এবং এর জন্য জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের ভাই বোন আর স্নেহের সন্তানদের যে ক্ষতি হয়েছে তার আলোচনা কখনো হতই না।

আর্টিকেল ৩৭০ এবং ৩৫এ জম্মু-কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, পরিবারবাদ এবং ব্যাপক মাত্রার দুর্নীতি ছাড়া আর কিছু দেয়নি। পাশাপাশি পাকিস্তান বরাবরই এই দুই ধারাকে দেশের বিরুদ্ধে কিছু মানুষকে উত্তেজিত করতে ব্যাপক ভাবে কাজে লাগিয়েছে।

হাজারো অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে আইন বানিয়েছে আমাদের দেশ। দুর্ভাগ্যজনক যে সংসদে অনেক আইন প্রচলিত। কিন্তু তার একটা বড় অংশই দেশের এক বিশেষ অঞ্চলে প্রযোজ্য হত না। এমনকি আগের সরকার, যারা কোনো একটা আইন বানিয়েই বিশ্বের কাছে প্রশংসা কুড়োতো, তারাও নিশ্চিত করতে পারত না যে সে আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবেই।

ভাবুন, দেশের অন্য রাজ্যের শিশুদের শিক্ষার অধিকার ছিল কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের সন্তানদের তা ছিল না। দেশের অন্য রাজ্যে মেয়েদের যে অধিকার মিলত জম্মু-কাশ্মীরের মেয়েরা তার থেকে অনেক দূরে ছিল।

দেশের অন্য রাজ্যে সাফাই কর্মচারীদের জন্য সাফাই কর্মচারী আইন চালু ছিল কিন্তু

জম্মু-কাশ্মীরের সাফাই কর্মচারীরা তা থেকে বরাবর বঞ্চিত ছিল। দেশের অন্য রাজ্যে দলিতদের উপর অত্যাচার হলে তা প্রতিরোধের আইন ছিল কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে তা ছিল না। দেশের অন্য রাজ্যে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য মাইনোরিটি অ্যাক্ট আছে কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে তা আগে ছিল না।

ধারা ৩৭০ বিলোপের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীর কে সরাসরি শাসন করার সিদ্ধান্ত খুব ভেবেচিন্তে নিয়েছে। এর পিছনের কারণটা বোঝা আপনাদের জন্য আজ খুব দরকার। যেদিন থেকে ওখানে রাজ্যপাল শাসন চলছে সেদিন থেকে জম্মু কাশ্মীর প্রশাসন সরাসরি কেন্দ্র সরকারের সংস্পর্শে কাজ করছে। এর ফলে শেষ কয়েক মাসে উন্নয়ন এবং সুশাসন তৃণমূল স্তরে যথেষ্টই দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র ভীষণ মজবুত। কিন্তু আপনারা জানলে অবাক হয়ে যাবেন যে জম্মু-কাশ্মীরে এমন হাজার হাজার ভাই-বোনেরা থাকে যারা লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের ভোট দিতে পারতো কিন্তু বিধানসভা বা স্থানীয় ভোটে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ ছিল না। এরা তারা যারা স্বাধীনতার পর দেশভাগের ফলে পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিল। আপনারাই বলুন এদের কি কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার থাকতে পারে না!

জম্মু-কাশ্মীরের ভাই-বোনেদের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই। আপনাদের জনপ্রতিনিধি আপনাদের দ্বারাই নির্বাচিত হবে, আপনাদের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে আপনাদের নেতা। যেমন আগে এমএলএ হতো তেমন এখনও এমএলএ থাকবে। যেমন আগে মন্ত্রিপরিষদ হত, তেমন এখনও মন্ত্রিপরিষদ হবে। যেমন আগে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকতো তেমন এখনও আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকবে।

যেদিন ভূস্বর্গ জম্মু-কাশ্মীর আবার একবার উন্নয়নের চূড়ায় পৌঁছে গোটা বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবে, নাগরিকরা এক মধুর জীবনযাত্রা পালন করতে থাকবে এবং এক সামাজিক জীবনে যা যা প্রয়োজন তা সব তারা পেতে থাকবে, মনে হয় না সেদিন আর জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে রাখার কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে।

বহু বছরের পরিবারতন্ত্র জম্মু-কাশ্মীরের যুবকদের থেকে নতুন নেতা উঠে আসতে দেয়নি। আজ সেই যুবকরাই জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নে নেতৃত্ব করবে এবং জম্মু-কাশ্মীর কে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেবে। জম্মু-কাশ্মীরের ভাই-বোনেদের আর ওখানকার ছেলেমেয়েদের আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব তারা যেন নিজেদের এলাকার বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হয়ে যাওয়ার পর লাদাখ এখন ভারত সরকারের স্বাভাবিক দায়িত্ব। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ও লাদাখ এবং কারগিল ডেভলপমেন্ট কাউন্সিলের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগ এখন অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

আজ কিছু লোক এই সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং কিছু লোক বিপক্ষে। গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক। আমি এই গণতান্ত্রিক মতভেদের সম্মান করি। এজন্যই এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যেসব

প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্র সরকার তার জবাব দিচ্ছে এবং দেবে। পাশাপাশি সমাধান করার চেষ্টাও করবে যথাযথ। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্বও বটে। তবে আমি আশা করবো যে, যে প্রশ্নগুলো আজ আলোচনার মধ্য দিয়ে সামনে উঠে আসবে তার সবই জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের সাধারণ মানুষের ভালোর কথা ভেবেই উঠবে। এই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার ভারতের আপামর জনতার সমর্থন চায়।

এটা সত্যি যে জম্মু-কাশ্মীর আজ ধারা ৩৭০ এর নাগপাশ থেকে মুক্ত। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে যে ছোট ছোট সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেখানকার অধিবাসীদের যে অসুবিধাগুলোর মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা তারা ধৈর্য্যের সঙ্গে করছে। কিছু মুষ্টিমেয় লোক, যারা পরিস্থিতির সুবিধা তুলতে চায়, খুব সন্তর্পনে তাদের মোকাবিলা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। কেন্দ্রের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরের ভাই-বোনেরা তা যথাসাধ্য পালন করছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের মদতদাতা পাকিস্তানে সমস্ত নোংরা পরিকল্পনার বিরোধিতা জম্মু-কাশ্মীরের দেশভক্ত মানুষেরা ঐকান্তিক ভাবে করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

ভারতীয় সংবিধানের উপর বিশ্বাস রাখা আমার ভাই-বোনেদের এক সঠিক নাগরিক জীবনের অধিকার আছে। আমরা ওদের নিয়ে গর্বিত। আমি আজ জম্মু-কাশ্মীরের সহনাগরিকদের আশ্বাস দিতে চাই যে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং তাদের সমস্ত সমস্যা একদিন দূর হয়ে যাবে।

জম্মু-কাশ্মীর দেশের স্বর্ণমুকুট। গর্ব হয় যে এটিকে রক্ষা করতে জম্মু-কাশ্মীর নিজের সন্তানদের বলিদান দিয়েছে আর নিজেদের জীবন নির্দধায় উৎসর্গ করেছে। এই সিদ্ধান্ত জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ সমেত গোটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। যখন এই অঞ্চলে শান্তি এবং সমৃদ্ধ করবে তখন শুধু ভারত সহ সারা পৃথিবীতে বিশ্বশান্তির স্বপ্ন এক নতুন পথে পা রাখবে।

১.২ রাজ্য সভাতে জম্মু-কাশ্মীরের পুনর্গঠনের বিষয়ে শ্রী অমিত শাহর দেওয়া জবাব এর কিছু প্রধান অংশ- ০৫ আগস্ট, ২০১৯

আমি আজ এই সংসদের সামনে জম্মু-কাশ্মীর কে নিয়ে এক ঐতিহাসিক সংকল্প ও বিল উপস্থাপন করছি। আমি সংসদের সামনে স্পষ্ট করতে চাই যে জম্মু-কাশ্মীরের একটা লম্বা রক্তপাত ভরা যুগ ধারা ৩৭০ সরানোর পর শেষ হতে চলেছে।

আমি এই বিষয়ে যাবার আগে আজ আমাদের প্রথম সর্বভারতীয় সভাপতি এবং যিনি ৩৭০ ধারাকে সরানোর জন্য বলিদান দিয়েছেন, সেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে স্মরণ করতে চাই।

ধারা ৩৭০ অস্থায়ী ছিল এবং একে কখনো না কখনো বাদ দিতেই হত। কিন্তু আগের

সরকারগুলি ভোটব্যাংকের জন্য একে সরানোর সাহস করেনি। আমাদের ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) আজকে সাহস দেখিয়ে এবং জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের ভালোর জন্য এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ধারা ৩৭০ এর কারণে জম্মু-কাশ্মীরে কখনোই গণতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়নি। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ থাকার ফলে দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছেছিল। বিশৃংখলা দিগন্ত পেরিয়ে আকাশে পৌঁছে গিয়েছিল। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর কারণে দারিদ্রতাও বেড়ে গিয়েছিল।

জম্মু-কাশ্মীরে ক্রমাগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবনতির কারণ ছিল ধারা ৩৭০। শিক্ষার জন্য এখানকার ছেলেমেয়েদের দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যেতে হতো, এর কারণ হলো ধারা ৩৭০। শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছিল এই অনুচ্ছেদ।

ভারত সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা জম্মু-কাশ্মীরকে পাঠিয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির জন্য সব টাকাই নষ্ট হয়ে গেছে। ৩৭০ কে ব্যবহার করে ওখানে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার আইন লাগু হতে দেওয়া হয়নি।

আমরা তো রাষ্ট্রের ভালোর জন্য বিল নিয়ে এসেছি। আপনারাই তো ইন্দিরা গান্ধীকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচার থেকে বাঁচানোর জন্য সাংবিধানিক সংশোধন ওইদিনই নিয়ে এলেন আর ওইদিনই পাশ করে দেশের গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়েছিলেন। আর আজকে আপনারাই আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন!

ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ সরানোর ফলে উপত্যকার, জম্মু এবং লাদাখের উন্নতি হবে। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ অপসারণের পরে জম্মু এবং কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হবে। ধারা ৩৭০এর জন্য জম্মু এবং কাশ্মীরে পর্যটন ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত বড় সংস্থাগুলি যেতে পারত না। এই সংস্থাগুলি যদি সেখানে যায় তবে সেখানকার লোকেরা কর্মসংস্থান পাবে। বড় সংস্থাগুলি সেখানে গেলে পর্যটন বাড়বে। তবে ৩৭০এর কারণে সেটি সম্ভব ছিল না আগে। এখন সম্ভব হবে।

এখন জম্মু কাশ্মীরের জনগণ নিজেরাই অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ১০ রিজার্ভেশন পাবে।

৩৭০ এর জন্য দেশের কোন বড় ডাক্তার জম্মু-কাশ্মীরে যেতে চান না কারণ তিনি সেখানে বাড়ি কিনতে পারবেন না। ভোটার হতে পারবেন না। এবং সেখানে নিরাপদ বোধ করবেন না। ৩৭০ স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিতে একটি বড় বাধা।

যদি শিক্ষার অধিকার আইন, নারীর সমস্ত অধিকারের আইন লাগু করতে হয় এবং তাদের সন্তানদের সব রকম অধিকার দিতে হয় তাও ধারা ৩৭০ অপসারিত হওয়া উচিত।

সন্ত্রাসবাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, সমৃদ্ধি এবং চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়ার মূল কারণটিও হলো ধারা ৩৭০।

সন্ত্রাসবাদের কারণে ৪১,৮৯৪ জন মানুষ মারা গিয়েছিলেন। কিছু লোক আছে,

যখনই কেউ সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাতে আসে, তখনই তারা ৩৭০এর জপ করে।

এখনও অব্দি ৪১,৮৯৪ মানুষ জম্মু-কাশ্মীরে কোন নীতির কারণে মারা গিয়েছে? অবশ্যই ৩৭০এর জন্যে। জহরলাল নেহেরু যে নীতি শুরু করে গিয়েছিলেন সেই নীতিই এখনো পর্যন্ত চলে আসছে। তাহলে এত মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

জহরলাল নেহেরুজিও বলেছিলেন যে একদিন ৩৭০ ধারা ঘষে ঘষে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা এত যত্ন করে রাখা হয়েছিল যে এটার ক্ষয় হয়নি। এটি অস্থায়ী অবস্থা কতদিন অবধি আর রাখা যাবে!

৩৭০ এর আওতায় বিচ্ছিন্নবাদীরা কাশ্মীরের যুবকদের বিভ্রান্ত করেছিল।

আমি বিশ্বাস করি যে যতক্ষণ অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ রয়েছে ততক্ষণ কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা যাবে না। কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য আর্টিকেল ৩৭০ এবং ৩৫এ সরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেকে এটিকে একটি অস্থায়ী বিধান হিসাবে বিবেচনা করে। তবে অস্থায়ীভাবে তৈরি ব্যবস্থা ৭০ বছর ধরে চলতে থাকবে! এটা কখন যাবে এবং কিভাবে যাবে? আপনারা এখানে সংসদে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন যে কাশ্মীরে রক্তপাত হবে! আপনারা উপত্যকায় কি বার্তা পাঠাচ্ছেন? আপনারা চান যে তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবস্থায় বাস করতে থাকুক! তাদের কি একবিংশ শতাব্দীতে থাকার অধিকার নেই!

আমরা ধর্মের রাজনীতি, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কাশ্মীরের শুধু মুসলমানরাই থাকে! আপনারা কি বলতে চান? মুসলমান, হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ সকলেই সেখানে বাস করেন। যদি ৩৭০ ধারা ভালো হয় তবে এটি সবার পক্ষে ভালো। যদি এটি খারাপ হয় তবে সবার পক্ষে খারাপ।

ধারা ৩৭০ রাজ্যের অনেক ক্ষতি করেছে। এর কারণে দুর্নীতি এবং দারিদ্রতা দুটোই বেড়েছে। ধারা ৩৭০ মহিলা এবং দলিত বিরোধী। ধারা ৩৭০ সন্ত্রাসবাদের শিকড়। এর জন্য শুধু এবং শুধুমাত্র ক্ষতিই হয়েছে। এর জন্য গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়নি, দুর্বল হয়েছে সেখানে।

সত্তর বছর ধরে গ্রামের প্রধানদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ধারা ৩৭০ এর কারণে জম্মু-কাশ্মীরে উন্নয়ন হয়নি। ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ এর কারণে কাশ্মীর ফকির হয়ে গেছে।

সেখানে ওবিসি রিজার্ভেশন পায়না। দলিত, আদিবাসীরা রাজনৈতিক রিজার্ভেশন পায় না। এ কারণে মায়াবতীর দল সমর্থন করেছে। কিছু পক্ষ আর কয়েকটি এনজিও ব্রিগেড এই বিলকে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানাবে শুনছি। তবে কেউ একশো শতাংশ বৈধ এই বিলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কিছু লোক, যারা স্পষ্টতই তিনটি পরিবারের সাথে যুক্ত, তারা সিমেন্টের এজেন্সি কিনে নিয়েছেন এবং সেখানে দেশের তুলনায় ১০০ টাকা বেশী হিসেবে সিমেন্ট বিক্রি করা হচ্ছে। যারা ৩৭০এর বিপক্ষে তারা বলুক যে এই অর্থ কোথায় গেল? আর দেশে বিশৃঙ্খলা

কাশ্মীরের জন্য নয়, রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য শুরু হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর উপত্যকার মানুষেরা কি পেল! জমির দাম বাড়েনি। যাদের কাছে জমি ছিল তার দাম বাড়েনি কারণ সেখানে ক্রেতা নেই। সেখানে কেউ জমি কিনতে পারে না।

আমরা উপত্যকার যুবকদের বুকে টেনে নিতে চাই। তাদের ভালো শিক্ষা, ভালো ভবিষ্যৎ, ভালো স্বাস্থ্য সুবিধা এবং রোজগার দিতে চাই। গোটা ভারতে যে রকম উন্নতি হয়েছে ঠিক একইভাবে কাশ্মীরে উন্নতি হোক এই জন্যই ৩৭০ ধারা কে সমাপ্ত করা জরুরি।

যেসব মানুষ কাশ্মীরের যুবকদের উসকে দেয় তাদের ছেলেমেয়েরা লন্ডন -আমেরিকাতে শিক্ষালাভ করতে যায়। তারা চিন্তিত নয় কারণ নিজেদের ব্যবস্থা তারা সবকিছু ভালোভাবে করে ফেলেছে। তবে উপত্যকার যুবকদের এখনও নিরক্ষর রাখার এবং তাদের উন্নতি না করার চেষ্টা অব্যাহত। কারণটি অবশ্যই ধারা ৩৭০।

কিছু সদস্য জম্মু-কাশ্মীর কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বানানোর জন্য আপত্তি করেছে। আমি বলতে চাই যে যখনই উপযুক্ত সময় আসবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এটিকে একটি পূর্ণ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের কোন আপত্তি থাকবেনা।

বলা হচ্ছে ৩৭০ না থাকলে ভারত থেকে জম্মু-কাশ্মীর আলাদা হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছিনা কেন হবে? মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ৩৭০ ছাড়াই নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রেখেছে। জম্মু-কাশ্মীরও পারবে। ৩৭০ স্থানীয় সংস্কৃতির রক্ষাকবচ ছিল না। এটা শুধুমাত্র তিনটে পরিবারকেই রক্ষা করে চলতো।

আগামী পাঁচ বছরে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অন্যতম উন্নত রাজ্য বানাবো। সঠিক সময় এলে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পূর্ণ রাজ্যে পরিবর্তিত করা হবে।

আমি কাশ্মীরের যুবকদের বলতে চাই নরেন্দ্র মোদীর উপর ভরসা রাখুন। খারাপ কিছু হবে না, হলে তা শুধুমাত্র কিছু দুর্বৃত্ত লোকের হবে। আগামী পাঁচ বছরে জম্মু-কাশ্মীরের ভিতর এক ব্যাপক পরিবর্তন এনে আমরা দেখিয়ে দেব।

এরকম যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সঠিক সময় নয়, বরং সঠিক এবং মজবুত রাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তি চাই। বড় এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বুকের পাটা থাকতে হয়। আমি গর্ব করে বলতে পারি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই গুন আছে।

১.৩ লোকসভায় জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলের ওপর আলোচনার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া উত্তরে কিছু প্রধান অংশ - ০৬ আগস্ট, ২০১৯

আমরা বলি কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অংশ। কিন্তু আমরা কখনই বলি না উত্তরপ্রদেশ ভারতের অভিন্ন অংশ বা তামিলনাড়ু ভারতের অভিন্ন অংশ। এর কারণ ৩৭০ ভারত এবং

গোটা দুনিয়াকে এক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, নাকি নয়!

আমরা কখনো এটা বলি না যে পাঞ্জাব ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা কখনো এটাও বলি না যে উত্তর প্রদেশ ভারতের অভিন্ন অংশ। শুধু কাশ্মীরের জন্যই এমন কেন বলা হবে? কারণ ৩৭০ জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করার কাজ করছিল।

একটু পরেই অনুচ্ছেদ ৩৭০ শেষ হয়ে যাবে। এর জন্য আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি কে ধন্যবাদ জানাতে চাইবো। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি জন্যই এই কাজ সম্ভব হতে চলেছে।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের উপর আমাদের দাবি আজকেও ততটাই মজবুত যতটা আগে ছিল। আর আগামীদিনেও ততটাই থাকবে। ওখানে চব্বিশটি বিধানসভার প্রত্যেকটাই অভিন্ন ভারতের অংশ।

আজ আমি যে বিল নিয়ে লোকসভার সামনে উপস্থিত হয়েছি তাতে আক্সাই চীন এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের প্রতি ইঞ্চি জমির কথা উল্লেখ থাকবে।

দু-একজন ছাড়া এখানে উপস্থিত সবাই অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের এই বিলের বিরোধিতা করেন নি। যারা এ বিলের বিরোধিতা করেছেন তাঁরাও চান ৩৭০ উঠে যাক। কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের বাধ্যবাধকতায় তাঁরা তা করতে পারছেন না।

ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার ভারতীয় সংসদের দুই কক্ষের একশো শতাংশ আছে।

আপাতত জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমি উপত্যকার মানুষদের আশ্বাস দিতে চাই যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে একে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে আমরা দু''বার ভাববো না।

যেদিন থেকে ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছিলো সেদিন থেকে উভয় দেশের সেনাদের নিজেদের সীমানা পেরোনোর কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দিক থেকে সেনারা সীমানা পেরিয়ে ভারতের দিকে প্রবেশ করে। ফলে এই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

আমি আপনাদের চাপের কাছে মাথা নত করবো না। উপত্যকা থেকে আপাতত সুরক্ষাবলকে সরানো হচ্ছে না, তাতে আপনারা যতই আলোচনা করুন। যাদের কাছে পাকিস্তানই ধ্যান-জ্ঞান তারা চর্চা করতে পারেন। কিন্তু আমি হুরীয়তের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসতে রাজি নই।

সেদিন যদি পন্ডিত নেহেরু ভারতীয় সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন তবে আজ পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ হত।

আজ কেউ কেউ ধারা ৩৭০ এবং ধারা ৩৭১ এর মধ্যে তুলনা টানা চেষ্টা করছেন।

আমি এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে এই দুই অনুচ্ছেদের মধ্যে কোন তুলনাই আসতে পারে না। আমি মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক,অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যকে আশ্বাস দিতে চাই যে ধারা ৩৭১ যেমন ছিল, বহাল তবিয়তে সেভাবেই থাকবে ভবিষ্যতে।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ অব্দি উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে বছরের পর বছর কারফিউ জারি থাকতো। ভালো খাওয়া-দাওয়া বাদ দিন, সামান্য রুটিটুকুও পাওয়া যেত না। আমরা জম্মু-কাশ্মীরে আধাসেনা এই কারণেই রেখেছি যে কেউ চাইলেও ওখানকার আইন ব্যবস্থার উপর আঘাত নামাতে পারবে না।

উপত্যাকার লোকেরা আমাদের। তাদের সমস্ত আশঙ্কা দূর করার দায়িত্বও আমাদের।

৩৭০ মুছে ফেলা এজন্যও প্রয়োজনীয় ছিল কারণ এই একটিমাত্র ধারার জন্য দেশের সংসদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছিল। দেশের আইন উপত্যকার সীমানায় ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসছিল।

জম্মু-কাশ্মীরের জন্য তৈরি করা আগের ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ছিল। ওখানে হিন্দুরা থাকে, শিখরা থাকে, জৈন সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে। কিন্তু ওখানে সংখ্যালঘু আয়োগ পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ৩৭০ এর জন্য।

এই ধারা জম্মু-কাশ্মীর কে উন্নয়নের রাস্তায় হাঁটতে দিচ্ছিল না। এই ধারা মহিলা বিরোধী ছিল, দলিত বিরোধী ছিল, আদিবাসী বিরোধী ছিল। ছিল বলতে শুধু সন্ত্রাসবাদের মদত। সামান্য স্বাস্থ্যব্যবস্থাও ওখানে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হচ্ছিল, কারণ ভারতীয় আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য হতো না।

বাকি দেশে আঠেরো বছরের কম বয়সের মেয়েরা বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু কাশ্মীরের মেয়েদের বয়স যতই কম হোক না কেন তার বিয়ে করতে কোন সমস্যা ছিল না। এটা কাশ্মীরের মেয়েদের প্রতি অন্যায় করতো তাদের কৈশোর আর শৈশবকে কেড়ে নিয়ে। এজন্যেই বারবার বলছি অনুচ্ছেদ ৩৭০ মহিলা বিরোধী।

আসাউদ্দিন ওয়েসী বলছিলেন আমরা এক ঐতিহাসিক ভুল করতে চলেছি। আমরা আসলে ভুল করতে নয়, ঐতিহাসিক ভুল শোধরাতে চলেছি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিগত পাঁচ বছরের ভারতজোড়া উন্নয়ন দেখে উপত্যকার লোকেরা বুঝতে পেরে গেছে ৩৭০ তাদের জন্য এক অভিশাপ ছিল।

জম্মু-কাশ্মীরে সংখ্যালঘু আয়োগ ছিল না কেন? জম্মু-কাশ্মীরে শিক্ষার অধিকার আইন ছিল না। শিক্ষকদের ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ ছিল না। এগুলো সবই অনুচ্ছেদ ৩৭০ এর জন্য সম্ভব হয়নি।

শুধুমাত্র এই একটা ধারার জন্য ন''টা সংবিধান সংশোধনী এবং একশো ছ''টা আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য ছিল না। সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪ তম সংশোধনীও সেখানে

কাজ করত না।

সারাদেশে দলিত এবং আদিবাসীরা রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সংরক্ষণ পেয়ে থাকে। জম্মু-কাশ্মীরে এতদিন তা পাওয়া যেত না।

ভারতীয় জনতা পার্টির পরম্পরা হলো তারা দেশের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়, ভোটের কথা ভেবে নয়। এমন সিদ্ধান্ত যা দেশের জন্য ভালো, যা দেশের সুরক্ষা কে মজবুত করবে তা নিতে আমরা দু"বার ভাবি না। যখন অটল বিহারী বাজপেয়ির সরকার তৈরি হয়েছিল তখন তিনিও চেয়েছিলেন এই ধারাকে মুছে দিতে। কিন্তু তাঁর কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। আনন্দের কথা হলো আজ তার দলই অনুচ্ছেদ ৩৭০ কে সরিয়ে দিতে চলেছে।

আগামী পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জম্মু-কাশ্মীরে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলবে, আমি নিশ্চিত, তা দেখে উপত্যকার লোকেরা বলবে একদিন ৩৭০ ধারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমাদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করা হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ মুছে যাওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীরে কলকারখানা খুলবে। লোকেরা কাজ পাবে। জমির জায়গা দাম বাড়বে। মানুষের জীবনের মানউন্নয়ন হবে। জম্মু-কাশ্মীর ভারতের ভূস্বর্গ ছিল, আছে, থাকবে। কাশ্মীরের উন্নতিতে কোন শক্তি আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

বলা হচ্ছে ৩৭০ না থাকলে ভারত থেকে জম্মু-কাশ্মীর আলাদা হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছিনা কেন হবে? মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ৩৭০ ছাড়াই নিজেদের সংস্কৃতি বজায় রেখেছে। জম্মু-কাশ্মীরও পারবে। ৩৭০ স্থানীয় সংস্কৃতির রক্ষাকবচ ছিল না। এটা শুধুমাত্র তিনটে পরিবারকেই রক্ষা করে চলতো।

আগামী পাঁচ বছরে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অন্যতম উন্নত রাজ্য বানাবো। সঠিক সময় এলে জম্মু-কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পূর্ণ রাজ্যে পরিবর্তিত করা হবে।

আমি কাশ্মীরের যুবকদের বলতে চাই নরেন্দ্র মোদীর উপর ভরসা রাখুন। খারাপ কিছু হবে না, হলে তা শুধুমাত্র কিছু দুর্বৃত্ত লোকের হবে। আগামী পাঁচ বছরে জম্মু-কাশ্মীরের ভিতর এক ব্যাপক পরিবর্তন এনে আমরা দেখিয়ে দেব।

এরকম যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সঠিক সময় নয়, বরং সঠিক এবং মজবুত রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি চাই। বড় এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বুকের পাটা থাকতে হয়। আমি গর্ব করে বলতে পারি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই গুন আছে।

পর্ব - ২

আর্টিকেল ৩৭০ এবং আমাদের অনুপ্রেরণাস্রোত ৩৭০ এবং ৩৫এ অপসারণ আমাদের প্রেরণাদাতা মহামানবদের প্রতি একটি আদর্শ শ্রদ্ধা। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশের অখণ্ডতার জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মহান ত্যাগের পরে ভারতীয়জনসঙ্ঘ, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি জন্য সংগ্রাম ও আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে করে চলে ছিল। দলটি সর্বদা এই বিষয়টিকে তার কার্যতালিকায় প্রথম সারিতেই রেখে এসেছে। এই বিভাগে আমাদের প্রেরণা পুরুষদের মহান আদর্শের কিছু নির্বাচিত অংশ দেখার চেষ্টা করবো।

২.১ জম্মু ও কাশ্মীর বিষয়ে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লোকসভা বিতর্কের সংক্ষিপ্তসার - ২৬ শে জুন, ১৯৫২

আমরা একটি সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে পেতে আগ্রহী যাতে কাশ্মীর সার্বিকভাবে ভারতের সাথে থাকে। গত পাঁচ বছরে কাশ্মীরের জনগণের সাথে সাথে আপামর ভারতবাসী যে সকল বিরাট ত্যাগ করেছে তার বিনিময়ে আমরা একটা ভালো ফলাফল পেতেই পারি যা সমগ্র জাতির লোকদের উপকার করবে। আমরা সেই ফল পেতে ভীষণভাবে আগ্রহী।

পতাকা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন। শেখ আবদুল্লাহ দু"দিন আগে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'অবশ্যই আমরা জাতীয় পতাকাটি স্বীকৃতি দেব।' জাতীয় পতাকা স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। এখানে জাতীয় পতাকা সকলের কাছে উপস্থিত এবং এটি স্বাধীন ভারতের পতাকা। শেখ আবদুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা উভয় পতাকা সমানভাবে ব্যবহার করব।' আপনি এটা করতে পারেন না। এটা অর্ধেকের প্রশ্ন নয়। এটা সাম্যের প্রশ্ন নয়। এটা পুরো ভারতের জন্য একটাই পতাকা ব্যবহার করার প্রশ্ন। ভারতের মধ্যে কাশ্মীরও অন্তর্ভুক্ত। তাই কাশ্মীরের আলাদা প্রজাতন্ত্র হওয়ার প্রশ্নই আসে না। পতাকা কোনও ছোট বিষয় নয়।

তারা কাশ্মীরে জাতীয় সম্মেলনের নিজস্ব পতাকা রাখুক। এতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি যখন সরকারের অংশ হিসাবে কাজ করেন, আপনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, কেবল একটিই পতাকা ব্যবহার করতে পারেন এবং তা হ"ল স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা।

মূল বিষয়টি হল কাশ্মীর কীভাবে ভারতের সাথে সার্বিকভাবে সংযুক্ত হতে চলেছে? কাশ্মীর কি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একটি পৃথক প্রজাতন্ত্র হয়ে উঠবে? আমরা কি এই সার্বভৌম সংসদে ভারতের সীমানার মধ্যেই এক কোণে আরেকটি সার্বভৌম সংসদ নিয়ে ভাবছি? এটি শেখ আবদুল্লাহর দাবি এবং আমরা এর বিরোধিতা করি। আমরা কি কাশ্মীরের জনগণের জন্য এমন এক অধিকারের কথা ভাবছি যে তারা ভারত থেকে যা খুশি পেতে পারে কিন্তু তার বিনিময়ে রাষ্ট্র এবং সমাজকে কিছু না দিলেও চলবে? অর্থ, সম্পদ, রাস্তা,

সেতু সব কি ছিনিয়ে নেওয়া হবে? এটি কি "দেওয়া - নেওয়ার" প্রশ্ন? নাকি এটি "নেওয়া এবং না দেওয়ার" প্রশ্ন? এই প্রশ্নের উপর সিদ্ধান্ত আজ নিতেই হবে। এই সিদ্ধান্ত ঠিক করে দেবে কাশ্মীরের মানুষের আচরণ কেমন হবে। আমরা এখন এই ভিত্তিতেই মানুষকে আমাদের সাথে নিতে পারি এগিয়ে চলতে পারি। আমি এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যাতে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেন। আমি তাঁকে সর্দার প্যাটেলের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করবো।

একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেল ব্যবস্থায় একটি রাজ্যের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অন্য অংশের নাগরিকদের থেকে আলাদা হতে পারে না। আমরা যে মৌলিক অধিকারগুলি বাকি ভারতের জনগণকে দিয়েছি জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীরা কি তার অধিকারী নয়?

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিভিন্ন আইন কোনোভাবেই বৈধ হওয়া উচিত নয়। সেটা হলে ভারতের ফেডারেল স্ট্রাকচার খুব দ্রুত ভেঙে পড়ার দিকে এগিয়ে যাবে। রাজ্যগুলির আর্থিক গঠনতন্ত্রের উপর ভারতের অডিটর জেনারেলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারও এখন রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হওয়া উচিত। রাজ্যগুলিতে আলাদা আলাদা হাইকোর্ট গঠন করা উচিত যাতে তারা প্রাদেশিক উচ্চ আদালতের মতো কাজ করে। ভারতের সমস্ত নাগরিক, তাদের রাজ্য বা প্রদেশ নির্বিশেষে, একই মৌলিক অধিকার এবং সমান আইনি ব্যবস্থার অধীনে থাকা উচিত। এই রাজ্যগুলি কেন্দ্রের সাথে সাংবিধানিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ব্যাপারে সমানভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। এই ব্যাপারগুলো কোনোভাবেই অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

আমি শরণার্থীদের প্রশ্নে আসতে চাই। আপনি জানেন যে আমরা এর আগেও এটি নিয়ে আলোচনা করেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের হাজার হাজার হিন্দু শরণার্থী অবশিষ্ট ভারতে বসবাস করছে। কেন তাদের জম্মু বা কাশ্মীরে জমি দেওয়া যাবে না? বাইরের লোকরা কেন এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে পারবে না? এটি এক চরম বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিফলন।

আমাদের সমাধান খুঁজতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরও বাকি রাজ্যের মত ভারতে সামিল হোক। শেখ সাহেব বলুন তিনি ঠিক কি ধরনের রক্ষাকবজ চান। তবে তার আগে তাকে বলতে হবে যে জম্মু ও কাশ্মীরের লোকেরা প্রথমে ভারতীয় এবং তারপরে কাশ্মীরি। প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত যে আমরা এই জাতীয় কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ চাই না, আমরা সার্বভৌম কাশ্মীরের ধারণা চাই না। আপনি যদি কাশ্মীর দিয়ে শুরু করেন, অন্য রাজ্যগুলিও এ জাতীয় দাবি করবে।

২.২ কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব - ০৭ আগস্ট, ১৯৫২

এটা সত্যি যে আমাদের প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা ন্যায্য আচরণ করা হয়নি, যা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। পিএম বলেছেন উনি পাকিস্তানি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়েছিলেন, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে সমাধান চেয়ে নয়। কাশ্মীর আইনগত ভাবে ভারতের অংশ।

রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বেশি প্রত্যাশা না করে আমরা এখন আমাদের প্রচেষ্টা দিয়েই বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করব। সেটাই হওয়া উচিত।

যে বিরোধটি এখনও চলছে তা কেবলমত্র কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশকে নিয়ে, যা শত্রুদের দখলে রয়েছে। আমরা বলি যে কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গ। সুতরাং, ভারতের একটি অংশ আজ শত্রুদের দখলে এবং আমরা সত্যিই অসহায়।

অন্য রাজ্য যদি কাশ্মীরের মতো একই দাবি করে থাকে, তবে আমরা কি তা পূরণ করবো? কখনই না।কারণ এরকম চলতে থাকলে এটি অখন্ড ভারতের অস্তিত্বের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠত। ইতিহাস বলছে কাশ্মীর বাদে অন্যান্য রাজ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছিল। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে রাজ্যগুলোর সম্মিলিত উন্নতি, সংযুক্তকরণ তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতির জন্য ভারতের সংবিধান অনুসরণ করা একান্ত জরুরি। আমরা এমন এক সংবিধান তৈরি করেছি যা সবার জন্য মঙ্গলময়। রাজ্যগুলো তাই নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবেই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে। এখানে কোন জবরদস্তি নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

আমি সংসদকে জিজ্ঞাসা করতে চাই - শেখ আবদুল্লাহ কি এই সংবিধানের কোনও পক্ষ ছিলেন না? তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তবে আজ তিনি রাজ্যের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলছেন। তিনি ৪৯৭ টি রাজ্য সহ ভারতের অন্যান্য বেশ কিছু অংশের জন্যে এই সংবিধানটি মানতে রাজি হয়েছিলেন। এটি যদি তাদের সকলের পক্ষে যথেষ্ট কল্যাণকর হয় তবে তা কেন শুধু কাশ্মীরের পক্ষেই ভাল নয়?

তবে কখনও মনে করবেন না যে, যখনই নীতিগত কিছু বিষয়ে আপনাদের আক্রমণ করা হয়, তখন কিছু সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আসলে আমরা আশঙ্কা করছি যে ইতিহাস নিজেই পুনরাবৃত্ত হতে পারে। আশঙ্কা করছি যে আপনি যা করতে যাচ্ছেন তাতে আবার ভারত বিভাজন হতে পারে। যারা শক্তিশালী ও সংযুক্ত ভারত দেখতে চান না, এরকম সিদ্ধান্ত তাদের হাত শক্তিশালী করতে পারে।

আমরা সহমতের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্তে আসতে চাই যা ভারতের একতাকে রক্ষা করবে এবং কাশ্মীরের অস্তিত্বকে পাকিস্তান থেকে আলাদা রাখবে। এবং অবশ্যই কাশ্মীর সামগ্রিকভাবে ভারতে যোগ দিতে পারবে।

শেখ আবদুল্লাহ ঘোষণা করুন যে তিনি সংসদের সার্বভৌমত্ব মেনে নিচ্ছেন। ভারতে দুটি পৃথক সার্বভৌম সংসদ থাকতে পারে না। একই সাথে আমরা কাশ্মীরকে ভারতের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করছি আর শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের জন্য একটি সার্বভৌম সংসদের কথা বলছেন। এটি বেমানান। এটি পরস্পরবিরোধী। আমাদের মতো কিছু লোক যারা এর বিরোধিতা করছে তাদের কাছে এই সংসদে লাভ-লোকসানের ব্যাপার নেই। তাহলে কেন আমরা স্বাধীন ভারতের এই সংসদের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে ভয় পাবো?

তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। শুরুটাও তিনি সেভাবেই করেছিলেন। আমাদের কয়েকজন স্বাভাবিকভাবেই এটা পছন্দ করেনি। আমরা কাশ্মীর সহ ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রীকে জানি এবং তিনি (নেহেরু) এখানে বসে আছেন। একটা দেশে দুজন প্রধানমন্ত্রী, একজন দিল্লিতে আরেক জনকে শ্রীনগরে আপনি কিভাবে রাখবেন! প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা একটা খুব ছোট জিনিস এবং আমাদের এটির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। তবে দেখুন প্রক্রিয়াটি কীভাবে চলছে! প্রতিটি পদক্ষেপে এক ধরণের বিশেষ আইন! ব্যাপারটা আপনাদের অন্যভাবে সামলানো উচিত ছিল।

ভারতীয়রা কি আপনার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে নেবে? ভারতীদের পছন্দ অনুসারে সম্পত্তি কিনতে হবে এমন পরামর্শ দেওয়া হয়নি। মনে করুন কয়েকজন ভারতীয় এসে কিছু সম্পত্তি কিনলো। আপনার নিজস্ব আইনগত ব্যবস্থা থাকতেই পারে। আমরা সেটা গ্রহণও করেছি। কিসের ভয় আমাদের? ভাবুন, একজন কাশ্মীরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের একজন কাশ্মীরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছেন। কোনো সমস্যা নেই। আমরা ভারতে খুশি। আমাদের এ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। আমরা তাদের স্বাগত জানাই। কিন্তু তুমি কিসের ভয় পাচ্ছ? এটাই কি যে ভারতীয়রা গিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করবে এবং তাদের মধ্যে একজন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবে? আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে অভিযান চালাচ্ছি না।

একটি বিশেষ বিধান কীভাবে কার্যকর করা যায় তা জেনে আমি সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম। আপনারা জানেন যে দুই লাখ মানুষ পাকিস্তানে চলে গেছেন। এই লোকদের কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনতে একটি বিশেষ আইন অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি কাশ্মীরের দরজা খুলতে যাচ্ছেন এবং পাকিস্তানীদের কাশ্মীরে ঢুকতে দিচ্ছেন। এ জন্য একটি বিশেষ আইন করতে হবে এবং একটি বিশেষ চুক্তি করতে হবে। একটা বিশেষ আইন করতে শেখ আবদুল্লাহর কিসের ভয় যাতে করে পাকিস্তানে চলে যাওয়া কাশ্মিরিদের ফেরত আনা যায়? এতে ভয়েরই বা কি আছে? তারা এলে নিরাপত্তাব্যবস্থাই বা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাবে!

কতজন পণ্ডিত কাশ্মীর থেকে দূরে এসেছেন জানি না। তাদেরও কাশ্মীরে ফিরে যেতে দিতে হবে।

আপনারা জানেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ এখন পাকিস্তানের দখলে। কাশ্মীর অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ হিন্দু ও শিখ আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের কী হবে? এদের খেয়াল রাখতে হবে।

২.৩ রাষ্ট্রপতির ভাষণে আলোচনায় হস্তক্ষেপ - ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের একটি অংশ এবং রাজ্যকে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। অনুরোধ করছি ভারতীয় সংবিধান মেনে নিন। এটি গণপরিষদ দ্বারা গঠিত একটি সংবিধান যার মাথায় অলিখিতভাবে ছিলেন স্বয়ং শ্রী জওহরলাল নেহেরু।

এটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা ভিত্তিক একটি সংবিধান। এটি কোনও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য দ্বারা লিখিত সংবিধান নয়। এটা যদি ভারতের চার কোটি মুসলমানের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় তবে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের পক্ষে কেন এটা মঙ্গলজনক হতে পারে না?

ওপারে ঠিক কতজন মানুষ মারা গেছেন? সরকারী পরিসংখ্যান বলছে এগারো। আমার কাছেই আছে কুড়িজনের নাম। আরও কুড়ি জন নিখোঁজ রয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কেরোসিন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের সংখ্যা ২০। এটি ২০ বা ৪০, যাই হোক না কেন, তাদের মেরে ফেলা হয়েছে। দু"হাজার লোককে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। তারা শুধু হিন্দু নন। এখানে হিন্দু, মুসলমান এবং সমাজের সব শ্রেণীর নারী-পুরুষ রয়েছে। কাউকে কাউকে শীতল জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল - নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তারা মারা যায়। নারী পুরুষকে নগ্ন করে আনা হয়। তাদের অকারণে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। কাউকে কাউকে বরফ স্ল্যাবের উপর শুইয়ে দেওয়া হয় হয়। নারীদের শ্লীলতাহানি ও মারধর করা হয়েছে। ওটাই কি গণতন্ত্র? আমরা কি জম্মু ও কাশ্মীরের সুরক্ষার জন্য লড়াই করছি না এইরকম সব 'অধিকারের' জন্য? তারা কি কোনোভাবেই গান্ধীবাদের প্রতিনিধিত্ব করে? [জম্মু ও কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাহ প্রশাসনের দ্বারা প্রজা পরিষদ কর্মীদের দমনের উপর]।

জম্মু-কাশ্মীর ব্যাংকে জম্মু শরণার্থীদের অনেক লোকের অর্থ আছে। অর্থমন্ত্রী কি জানেন যে তারা নিজস্ব নথি তৈরি করতে না পারায় তাদের টাকা তোলার অনুমতি নেই? তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরের হাইকোর্টে গিয়েছিলেন এবং উচ্চ আদালত একটি আদেশ দিয়েছিল যে এই টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। এই অর্থ প্রদান থেকে ব্যাংককে নিষিদ্ধ করে একটি অধ্যাদেশ পাস করা হয়েছিল। এইসব অভিযোগের উপর অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত।

২.৪ জম্মুর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় হস্তক্ষেপ - ২৫ শে মার্চ, ১৯৫৩

এবার আমাদের ভাবতে হবে ভারতের সংবিধান ভারতের সীমানার মধ্যে কতদূর এবং কতটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমি একমত যে পুরো সংবিধানটি যদি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করা নাও যায় সংবিধানের কমপক্ষে যে অংশগুলি প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক হিসাবে বিবেচিত তা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। আমি বুঝতে পারছিনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনো প্রয়োগ না করার কারণ কি। মৌলিক অধিকার, নাগরিকত্ব, সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার, রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা, আর্থিক ক্ষেত্রের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এক্ষুনি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২.৫ জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং রিপোর্ট জম্মু-কাশ্মীরে আন্দোলন

গত বছরের শুরুর দিকটা জম্মু-কাশ্মীরে আন্দোলন করতে করতেই কেটে গেল।

অধিবেশন শেষ হতেই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাহ কে চিঠি লিখে নীতি পরিবর্তনের দাবি করলেন। পন্ডিত নেহেরুর চিঠির উত্তর এল। কিন্তু তাতে বিষয় থেকে সরে যাওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা ছিল। কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট ছিল কাশ্মীর সম্বন্ধে ওনার দৃষ্টিকোণ জনসঙ্ঘের থেকে আলাদা ছিল এবং উনি শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাহ প্রতি অন্ধবিশ্বাস দিয়েই কাশ্মীরে নিজের নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। পন্ডিত নেহেরুর উত্তরের পরিপেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ করতে সর্বভারতীয় কার্য সমিতির বৈঠক ডাকা হল। ভারত সরকারের দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট ছিল। তবু সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো কাশ্মীর বিষয়ে নিজেদের দাবী তীব্রতর করা হবে। ফলত ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পন্ডিত নেহেরু কে আবার চিঠি লিখলেন, কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হল না। ডক্টর মুখার্জী সিদ্ধান্ত নিলেন পন্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন, কিন্তু পন্ডিত নেহেরু দেখা করতে চাইলেন না। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছাড়া আর কোন রাস্তা অবশিষ্ট ছিল না।

রাম রাজ্য পরিষদ এবং হিন্দু মহাসভা এই বিষয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কে যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন। তাদের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে এক সংযুক্ত কমিটি শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের একটা খসড়া তৈরি করে। রাম রাজ্য পরিষদ এবং হিন্দু মহাসভার সাথে এক বিরাট যৌথ জনসভায় ১৯৫৩ সালের ৬ মার্চ এই সত্যাগ্রহের ঘোষণা করা হলো। এটাও ঠিক করা হলো জম্মুর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েই এই সত্যাগ্রহ শুরু করা হবে। দিল্লি সরকার শেষ মুহূর্তে ১৪৪ ধারা জারি করে এই মিছিলের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। স্বভাবতই যেখানে লক্ষাধিক জনতা বলিদান দেওয়া বীরেদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে জড়ো হয়েছিল সেখানে এরকম আদেশ দিয়ে জনতাকে আটকানো কঠিন ছিল। তবে পুলিশ লাঠি চালালো ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটালো। এবং শেষমেষ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, বৈদ্য গুরুদত্ত এবং ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি তথা শ্রী নন্দন শাস্ত্রী কে গ্রেপ্তার করা হলো।

সত্যাগ্রহ এবং দমন

সারা দেশ এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেছিল এবং রাজ্যগুলি থেকে একাধিক সত্যগ্রাহী গোষ্ঠী দিল্লি এবং পাঠানকোটের দিকে অগ্রসর হয়। দিল্লী এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার এই সত্যাগ্রহ কে দমন করতে উচিত-অনুচিত সমস্ত রকমের পদক্ষেপ করেছিল। উত্তরপ্রদেশে ধারা ১৪৪ লাগু করে সত্যাগ্রহীদের মালা পড়ানো বা তাদের নিজেদের ঘরে বা তাদের নিজেদের ঘরে স্থান দেওয়া বা সহানুভূতি দেখানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জম্মু কাশ্মীরের ভারতভুক্তি দাবি করা সমস্ত সভা, মিছিল, এমনকি পোস্টার লাগানোও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে কথা বলা ব্যক্তিদের বাক স্বাধীনতা পুরোপুরি বজায় ছিল। প্রান্তীয় সরকারগুলো এই প্রকার অগণতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা চারদিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে হতে থাকলো। পাঞ্জাব সরকার তো আবার এক কদম এগিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার এক মাস আগেই

জনসঙ্ঘের সমস্ত কার্যকর্তাদের বন্দি করে নিয়েছিল এইভাবে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর সমস্ত রাস্তাই সরকার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। উত্তর প্রদেশেও জনসঙ্ঘের নেতাকর্মীদের জায়গায় জায়গায় ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সাহারানপুরে দু'জন কর্মীকে গৃহবন্দী করা হয়েছিল। সত্যাগ্রহীদের ভিড় সকল প্রকার সরকারী দমনপীড়নের পরেও থামেনি। দিল্লিতে, কেবল সত্যাগ্রহীদেরই মারধর করা হয়নি, পথচলতি লোকদের উপরও আক্রমণ করা হয়েছিল। কারাগারে নির্যাতন করে সত্যাগ্রহীদের নৈতিক শক্তি শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আইনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের জন্য কঠোর কারাদণ্ড ও ভারী জরিমানার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে অফিস বা বাড়িতে রাতে অভিযান চালিয়ে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘনের জন্যও মামলা করা হয়েছিল। জরিমানা আদায়ের জন্য বাড়ির সমস্ত জিনিস নিয়ে নেওয়া হচ্ছিল এবং এমনকি বাচ্চাদের দুধের বোতলও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

সরকারি দমন-পীড়নের মাধ্যমে সত্যাগ্রহকে আটকে দেওয়া কোনদিনই সম্ভব ছিল না। তবুও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের লড়াই এক আইনি লড়াই। তাই নীরব দর্শকের মতো পুলিশের কঠোর দমননীতির এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের বেআইনি ব্যবহার সহ্য করা সত্যাগ্রহের স্পিরিটের বিপক্ষে হবে। সেজন্য আমরা সরকারি অসাম্যের বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধেও নেমেছিলাম।

এর সূচনা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতাদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে শ্রী রামনারায়ণ সিং (এমপি) দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হাবিয়াস কপার্স আবেদন দিয়েই হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন মঞ্জুর করে এবং ডঃ মুখার্জী ইত্যাদিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সরকারী অবিচারের নিন্দা সারা দেশে চলতে থাকে। সমস্ত পত্রিকা সরকারের পদক্ষেপের নিন্দা জানায়। সংসদেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু মসৃণ পাত্রের দ্বারা জল ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। আলোচনায় তাই ফল কিছু বেরোলো না। তবে যেসব সত্যগ্রাহীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তাদের তরফ থেকেও আবেদন করা হয়েছিল এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে ১০০ ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ততা বাতিল করা হয়েছে বা শাস্তি ন্যূনতম করা হয়েছে। এমনকি আটক হওয়া শতাধিক ব্যক্তিদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট দুজন বাদে সবাইকে মুক্তি দিয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জেল থেকে বেরিয়েই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে জম্মু-কাশ্মীর এবং অবশিষ্ট দেশের অখন্ডতা বিষয়ে জনমত সংগঠিত করতে থাকলেন। এমনিতেই জনসঙ্ঘের বিভিন্ন সভা, সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন এবং শহীদদের প্রতি সম্মানের বিভিন্ন কার্যক্রম জনগণের চোখে কাশ্মীর বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। শুরুর দিকে যে সমস্ত পত্রপত্রিকা আমাদের সঙ্গে ছিল না পরবর্তীতে তারাও আমাদের সঙ্গ দিতে থাকলো। এই ইস্যুতে এরপর যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল প্রতিটিতে আমরা জয় পেয়েছিলাম। কিন্তু নেহরুজি দলগত ভাবনা এবং ব্যক্তিগত সম্মানের মোহে কাশ্মীর বিষয়ে নিজের নীতি পরিবর্তন করতে তৈরি ছিলেন না

জনসংঘের আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। তবে আমাদের উদ্দেশ্য সরকারের সাথে লড়াই করার ছিল না। আমরা চাইছিলাম সরকার জম্মুর নেতাদের সাথে আলোচনা করে নিজেদের নীতি বদল করুক। সত্যাগ্রহ চলাকালীনও আমরা বরাবর আলোচনার জন্য তৈরি ছিলাম। ডক্টর মুখার্জী সংসদে নেহেরুর কাছে জোরদার আবেদন করলেন নিজের নীতি বদল করতে। আমরা চাইছিলাম সরকার জম্মুর প্রকৃত পরিস্থিতি জানুক। প্রজা পরিষদের নেতা এবং কাশ্মীর সরকারের মধ্যে যাতে এক সদ্ভাবপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় তার চেষ্টাও করছিলাম। সেই উদ্দেশ্যেই কানপুর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমরা কাশ্মীরে এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদেরকে কাশ্মীর প্রদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অবশ্য পাঞ্জাব প্রদেশের জনসঙ্ঘের উপপ্রধান অনেক কষ্টে জম্মু পৌঁছেছিলেন। তিনি আমাদের যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা যথেষ্ট চিন্তাজনক ছিল। সত্যাগ্রহ শুরু হবার সময় ব্যারিস্টার উমাশংকর ত্রিবেদী এবং দেশপান্ডে সাহেব জম্মু যাওয়ার অনুমতি পত্র চেয়েছিলেন। তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই ওনারা বিনা পারমিটেই কাশ্মীর যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের জলন্ধরে আটকে দেওয়া হয়।

ডক্টর মুখার্জী সিদ্ধান্ত নিলেন কাশ্মীরের এই লৌহ আবরণকে ভেদ করে জম্মু যাবেন। শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ এবং ভারত সরকারকে আগেই জানানো হয়েছিল। মুখার্জী ১৯৫৩ সালের ৬ মে দিল্লি থেকে রওনা দিয়েছিলেন। হাজার হাজার নাগরিক ''ভারত ও কাশ্মীর এক হোক'' ''ডঃ মুখার্জীর জয় হোক'' শ্লোগানের মাঝে তাদের নেতাকে বিদায় জানালেন। গোকুল থেকে মথুরা যাওয়ার মত দৃশ্য ছিল। অনেকেই কাঁদছিল। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের মহান নেতাকে অনুসরণ করার যিনি অবিচারের বৃত্তটি ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। পথে স্টেশনে স্টেশনে সংবর্ধনা হচ্ছিল। দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের মানুষ উপচে পড়েছিল সেদিন।

আশা ছিল পাঞ্জাব সরকার ডঃ মুখার্জীকে পাঠানকোট পৌঁছতে দেবে না এবং পথেই তাকে আটক করে নেবে। তবে হল উল্টোটা। সরকার তাদের পরিকল্পনা মতো ওনাদের কাশ্মীরে প্রবেশের পূর্ণ সুযোগ দিল। আর কাশ্মীর রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছানোর সাথে সাথেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে শ্রীনগরের সাবজেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারত ও কাশ্মীর সরকারের এই ষড়যন্ত্রের এবং ডঃ মুখার্জীর গ্রেপ্তারের ফলে পুরো ভারতজুড়ে ক্রোধের সূত্রপাত হয়েছিল। চারদিকে প্রতিবাদ দিবস পালিত হচ্ছিল। প্রতিবাদ সভার জন্য দিল্লির দিওয়ান হলে জড়ো হওয়া লোকদের নির্মমভাবে আক্রমণ করা হল। পাঠানকোটে একটি ''পারমিট তেরো মোর্চা'' প্রতিষ্ঠিত হল। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকলো। পাঁচশো সত্যাগ্রহী পুলিশ বাধা অতিক্রম করে প্রবল উদ্যমে দুর্গম নদী এবং বন পেরিয়ে জম্মুতে পৌঁছল। ফলে সেখানে সত্যাগ্রহ একটা নতুন গতি পেয়েছিল।

চারদিক থেকে আসা ক্রমবর্ধমান চাপ সহ্য করা সরকারের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নিজের গোপন নীতি সামনে চলে আসার পর শেখ আব্দুল্লাহ আরো খোলাখুলি ব্যাট করতে

আরম্ভ করলেন। নেহেরুজি কাশ্মীরে গেলেন। তিনি দেখলেন কিভাবে তার নীতি ব্যর্থ হয়েছে। আলোচনার পর্ব শুরু হলো।কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসার আগেই নেহেরুজি মহারানী এলিজাবেথের রাজ্য অভিষেক উপলক্ষে লন্ডন চলে গেলেন। উনি ফেরা অব্দি আলোচনা বন্ধ রইল। কিন্তু...

কাশ্মীরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর গ্রেপ্তারি বেআইনি ছিল। এরপর ওনার মুক্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হলো। ওনার আইনি পরামর্শদাতারা প্রথমে কাশ্মীর হাইকোর্টে আবেদন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই উমাশঙ্কর ত্রিবেদী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আইনি পরামর্শদাতা হিসাবে শ্রীনগর গেলেন। শেখ আব্দুল্লাহ তাঁকে মুখার্জীর সাথে একা দেখা করার অনুমতি দিলেন না। কিন্তু হাইকোর্ট আদেশ দিল ত্রিবেদী সাহেবকে মূখার্জি বাবুর সাথে একা দেখা করতে দিতে হবে। ত্রিবেদী হাইকোর্টে মুখার্জীর মুক্তির আবেদন করলেন। ২৩শে জুন সিদ্ধান্ত আসার কথা ছিল। কিন্তু ২৩শে জুন রাতের বেলাতেই ডক্টর মুখার্জীর মৃত্যু হয়।

ডক্টর মুখার্জীর মৃত্যু এক অকল্পনীয় ঘটনা ছিল। দেশ তার জন্য তৈরি ছিল না। আমাদের কাছে ওনার অসুস্থতার কোন খবর ছিল না। সত্যি বলতে কি উনি অসুস্থ ছিলেনও না। জেলে নাকি উনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। জেলের ডাক্তার আলী মহম্মদ ওনার চিকিৎসা করছিলেন। চিকিৎসার ফল হলো শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত্যুকালীন সময়ে ওনার সঙ্গীদের বা ব্যারিস্টার ত্রিবেদীকে ওনার সাথে থাকতে দেওয়া হয়নি। যোগ্য চিকিৎসার অভাব এবং পরিকল্পনামাফিক অবহেলা ফলে ডক্টর মুখার্জীর এই মৃত্যুকে দেশের মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যু বলে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। সবাই এই মৃত্যুকে সন্দেহ করছিল। তাই নিরপেক্ষ বিচারের দাবি উঠল। সংসদের ভিতরে এবং এবং বাইরে তদন্তের দাবি জোরদার হচ্ছিল। সরকার বলপূর্বক সেই দাবিকে দমিয়ে দিতে চাইল। ভারত সরকার নিজের উপর আসা কলঙ্ককে ধুয়ে দেওয়ার জন্য তৈরী ছিলো না। বকশি গোলাম মহম্মদ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সময় থাকতে উনিও সক্রিয় সহযোগিতা করলেন না। জনসঙ্ঘের বিধায়ক শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তদন্তের প্রস্তাব রাখলেন। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। আমরা বিভিন্নভাবে তদন্তের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে যাচ্ছিলাম। ওনার মৃত্যুরহস্যে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমরা শান্তি পাচ্ছিলাম না।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর পর কাশ্মীর সরকার বৈদ্য গুরুদত্ত, ঠেকচাঁদ শর্মা এবং পন্ডিত প্রেমনাথ ডোগরাকে জেল থেকে ছেড়ে দিলো। সাথে সাথে জম্মু পরিষদের স্থানীয় নেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছিল। কাশ্মীরের উপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ দিল্লি এলেন এবং পন্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্মা ও পন্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা করলেন। পন্ডিত জহরলাল নেহেরু এক বিবৃতিতে সত্যাগ্রহ বন্ধ করার আবেদন করলেন। আবার আলোচনা শুরু হল। এই আলোচনার পরিনাম হলো এই যে সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতি সত্যাগ্রহ শেষ করে সরকারের কাছে আবেদন

করলেন যে তারা নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে ভারত কাশ্মীর সংযুক্তকরনের রাস্তা নিক। পরবর্তী ঘটনায় বোঝা যায় সরকার নিজের রাস্তা তো বদলেছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এখনও পূর্ণ হয়নি।

দিল্লি, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশকে এই আন্দোলনের অধিকাংশ ভার বহন করতে হয়েছিল। তবে বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং বাংলার বিপুল সংখ্যক সত্যাগ্রহীরাও এতে অংশ নিয়েছিলেন। সত্যগ্রাহীরা সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, মুম্বই, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও একত্রিত হয়েছিল। তবে তাঁর প্রাথমিক দুটি-চারটি দলই শুধু সত্যাগ্রহ করতে পেরেছিল। পরবর্তীতে সত্যাগ্রহ স্থগিত হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে ১০,৭৫১ জন সত্যাগ্রহী এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ৭ জুলাই সত্যাগ্রহ বন্ধের ঘোষণা করা হয়। এর আগে, ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে বিবেচনা করে এবং জনসংঘের সংগঠন আরও দৃড় করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা করে। পন্ডিত মোলিচন্দ্র শর্মার শক্ত হাতে প্রধানমন্ত্রীর(জনসংঘ) সাথে সাথে কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। নিজের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা না করেই জায়গায় জায়গায় ঘুরে জনসঙ্ঘের সংগঠন মজবুত করার জন্য তিনি কতটা পরিশ্রম করেছেন তা আর বলার প্রয়োজন পড়ে না। আজ আমরা আবার তাঁকে এই ভার দিয়েছি এবং আমরা বিশ্বাস করি জনসঙ্ঘ যে বড় লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছে তার নিরন্তর প্রেরণা আমাদের মহান কার্যকর্তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে।

১৫-১৬ আগস্ট, ১৯৫৩ প্রয়াগে সর্বভারতীয় প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। দলীয় সংবিধানের বিষয়ে বেশ কিছু পরিবর্তনও সেখানে আনা হয়েছে। আমরা ঠিক করেছি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্মৃতিসৌধ তৈরি করব। তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটা ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে। প্রয়াগ অধিবেশন থেকে ফিরে আমাদের পূর্ণ উদ্যোমে লাগতেই হত।

(অর্গানাইজার, ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯৫৪)

২.৬ ডঃ মুখার্জী বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার তীব্র বিরোধি ছিলেন

২৩ শে জুন ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহর কারাগারে "শহীদ মৃত্যু" বরণ করেছিলেন। শেখ আবদুল্লাহ তখন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমাহীন "প্রধানমন্ত্রী" ছিলেন। পরে তাকে কেবল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং পাঁচ বছরের জন্য কারাগারেও পাঠানো হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদের নখের যোগ্য ছিলেন না। অবশ্য তিনি বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই আবার নিজের অভিসন্ধিমূলক কাজ শুরু করেন। আজ তিনি পানাহ কারাগারের অভ্যন্তরে রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে। তবে যে কারণে ডঃ মুখার্জী শেখের কারাগারে যেতে ভয় করেননি এবং ফলস্বরূপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন,

তা আজও অসম্পূর্ণ।

ডক্টর মুখার্জী দেশের অখন্ডতার জন্য জীবন দান করেছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের অধীনে যে সমস্ত অধিকার জম্মু-কাশ্মীর সমেত কোন রাজ্যের বাসিন্দা পেতে পারে তার মধ্যে কোনো বিভেদ থাক সেটা তিনি চাননি। আব্দুল্লাহ এবং তার সহযোগীদের চক্রান্তমূলক মানসিকতা তিনি স্বীকার করেন নি। জম্মুর জনগণও রাজ্য সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মুখার্জী এটা কখনোই চাননি যে জম্মুর জনগণ অবশিষ্ট রাজ্যের মুসলিমদের অত্যাচার এইজন্য সহ্য করুন যাতে ভারতের অংশ হয়ে জম্মু-কাশ্মীর চিরকাল থেকে যাবে। উনার মনে হয়েছিল ভারত সরকারের কখনই কাশ্মীর সরকারের পক্ষ নেওয়া উচিত নয় আর সাধারণ মানুষের ভালো-মন্দ কে উপেক্ষা করাও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুচিত। জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নিয়মিত পন্ডিত নেহেরুকে চিঠি দিতেন এবং বিষয়গুলি সংসদে উত্থাপিত করতেন।

একথা সত্যি যে জম্মু-কাশ্মীর প্রজা পরিষদ এবং জনসংঘের আন্দোলন আর ডক্টর মুখার্জীর আত্ম বলিদানের জন্যই রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছিল। তবে গভীরে দেখলে বোঝা যায় যে মৌলিক ব্যাপার গুলিতে এখনও বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। সম্ভবত জম্মু-কাশ্মীর বিষয়ে বক্সী সাহেব এবং আব্দুল্লাহ মতাদর্শে বিশেষ কোন ফারাক নেই। ওই রাজ্য আজও ভারতের অবিভাজ্য অংশ নয়। জম্মু-কাশ্মীরে ভারত সরকারের শাসন চলে না। ওখানে প্রান্তীয় সরকারই শেষ কথা বলে। ভারতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব ওই রাজ্যে খাটে না। ওখানে আমাদের থাকা, কাজ করা এবং জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মানে আজও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

রাজ্য সরকার বারবার এটাই বোঝাতে চায় যে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের স্বার্থেই এই অন্যায্য অসাম্য বজায় থাকা দরকার। এর পিছনে এক গূঢ় স্বার্থ লুকিয়ে আছে। বছরের পর বছর এভাবে চলতে চলতেই ভারত এবং জম্মু-কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক বাধা তৈরি হয়ে গেছে আজ। ওই রাজ্যের আর্থিক বিকাশেও এই স্বার্থবাদ বরাবর বাধা দিচ্ছে। এদিকে যখন ভারত সরকার পক্ষপাতহীনভাবে বিদেশি পুঁজিকে দেশে ডেকে এনে ভারতের আর্থিক উন্নয়নের গতি আনতে চাইছে, তখন জম্মু-কাশ্মীরের নিজস্ব আইন এই পুঁজিকে রাজ্যে ঢুকতেই দিচ্ছে না। বিদেশি কোম্পানি বাদ দিন, কাশ্মীর সরকার ভারতীয় শিল্পপতি এবং উদ্যোগপতিদেরও ওই রাজ্যে কাজ করতে দেয় না। সত্যি বলতে কি কাশ্মীরের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে। কাশ্মীরি যুবকদের কাজ চাই। রোজকার চাই। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন ওখানে শিল্প স্থাপন হবে। কিন্তু বর্তমান সরকার শুধুমাত্র টুরিস্ট তথা পর্যটকদেরই রাজ্যে চায়, শিল্পপতি বা উদ্যোগপতিদের নয়।

সরকারি প্রশাসন জম্মুর পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে রাজ্যবিহীন ঘোষণা করে তাদের নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ভারত সরকার অন্য দেশের ভারতীয় নাগরিকদের

অধিকারের কথা তো ভাবতে পারে, কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কথাই ভাবতে পারে না। তারা সামান্য নাগরিকত্বের অধিকার টুকুও আজ পায় না। সবথেকে বড় কথা রাজ্য সরকারের এই মানসিকতা সাম্প্রদায়িক নীতির ওপর নির্ভর করে বেড়ে উঠেছে। কাশ্মীর সরকার ভয় পাচ্ছে যদি জম্মুর সমস্ত মানুষকে ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তো রাজ্যের "বিশেষ ধরনের অনুপাত" উল্টে যেতে পারে। পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা বাকি দেশের মতো জনসংখ্যার অনুপাতে ঠিক না করে নিজেদের মতো করে নির্ণয় করেছে রাজ্য সরকার। এজন্য দাড়িপাল্লায় কাশ্মীরের দিকটা ভারী হয়ে পড়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশদের কূটনীতির সাথে মিলে যায়। ইংরেজরা সংখ্যালঘুদের অত্যাধিক অধিকার দেওয়ার জন্য ঠিক এরকম নীতিই নিয়েছিল।

এমনটা কিন্তু নয় যে ভারতের অন্য রাজ্যের নাগরিকদেরই শুধু অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে কাশ্মীর সরকার। বরঞ্চ রাজ্যেরই বিপুলসংখ্যক মানুষের লোকসভা ভোটে বা সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রপতি এখানকার মন্ত্রীদের নাম সুপারিশ করেন। একইভাবে আইনসভাতেও রাজ্যের প্রতিনিধি হয়, জনতার প্রতিনিধিরা এখানে সামনে আসতে পারে না। এই কারণে নির্বাচন শুধুমাত্র ক্ষেত্রীয় এবং স্থানীয় ইস্যুর ওপর নির্ভর করা হয়। এর কোন সর্বভারতীয় রূপ নেই। স্বাভাবিকভাবেই এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো সর্বভারতীয় বিষয়গুলি থেকে নিজেদের দূরে রাখে। প্রজা পরিষদের মতে রাজ্যের লোকেদের ভারতের বিষয়ে জানতেই দেওয়া হয় না। সংবিধান এবং শাসনের অধিকারের ব্যাপারে রাজ্য সরকার ভীষনই পক্ষপাতমূলক আচরণ করে। সরকার কোনভাবেই চায় না স্বাভাবিক অধিকার গুলো মানুষ যথাযথভাবে ভোগ করুক। আর এটা শুধু ক্ষমতাসীন সরকারের ব্যাপার নয়, স্থানীয় সমস্ত রাজনৈতিক দলই এই মতাদর্শে বিশ্বাসী। ওরা চায় না মানুষের মধ্যে ভারতীয় সেন্টিমেন্ট গড়ে উঠুক। ভারতের সাথে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মানসিক মিলনের পথে যত রকম বাধা সৃষ্টি করা যায় রাজ্য সরকার তা করে। মূলত এই জন্যেই রাজ্যের জন্য একটা আলাদা পতাকার বন্দোবস্ত করেছে ওরা। একটা 'সদর ই রিয়াসত' পদ বা পৃথক সংবিধান এই মানসিকতারই প্রতিফলন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। উনি সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা, যেটা অস্থায়ী রূপে কিছুদিনের জন্য শামিল করা হয়েছিল, মুছে ফেলার পক্ষপাতী ছিলেন। উনি ভারত সরকারকে বারবার সতর্ক করে বলেছিলেন কাশ্মীরকে যদি এরকম ছাড় দেওয়া হয় তবে কিছুদিন বাদে অন্য রাজ্যগুলিও এই দাবি তুলতে থাকবে। আজ বোঝা যায় উনি কতটা সঠিক ছিলেন। যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা পাঞ্জাবে আকালি আন্দোলন গড়ে তুলেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এই রোগ ক্রমশ ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়বে যদি না অবিলম্বে এর প্রতিকার করা যায়।

ভারত সরকার নিজেদের কে আকালি আন্দোলনের সমস্ত দাবির বিপক্ষে তুলে ধরেছে। ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী দল এবং জনগণও মনে করে এই আন্দোলনের দাবিগুলো

ভুল। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কি হবে? এর সমস্যাগুলো তো একই সাথে দূর করা উচিত ছিল।

এবার থেকে পুরো দেশ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস পালন করবে। আসুন এই উপলক্ষে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে লক্ষ্য পূরণের জন্য শ্যামাবাবুকে নিজের প্রাণ দিতে হয়েছিল তা আমরা পূরণ করেই ছাড়বো। যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে মনে রাখবেন ডক্টর মুখার্জীর মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি আরো অনেকের হতে পারে। ওনার মৃত্যু ৩৭০ ধারার জন্য হয়েছিল। আসুন দাবি করি এই ধারা মুছে ফেলতে হবে।

জম্মু যাওয়ার পথে ডক্টর মুখার্জী একটা সভায় বলেছিলেন "হয় আইন দেব, নয় জীবন দেব"। আইনের অর্থ উনি একটা রাজ্য বোঝাতে চাননি। উনি কাশ্মিরের জনগণকে ভারতীয় সংবিধান উপহার দিতে চেয়েছিলেন। আজ কাশ্মীর ভারতের একটা চুক্তিভিত্তিক রাজ্য। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান ওখানে চলে না। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা শান্তি পাবো না যতক্ষণ কাশ্মীরের জনতা ভারতীয় সংবিধানের সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পায় যা অবশিষ্ট ভারতের অধিকাংশ জনগণ দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসছে। আমাদের সেই পরিস্থিতি আনতে হবে যখন কাশ্মীরের ভাই বোনেরা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের প্রগতিতে সাহায্য এবং অংশগ্রহণ করবে। যদি এরকম সম্ভব হয় শুধুমাত্র তবেই ওনারা বুঝবেন পাকিস্তান এবং চীনই ওনাদের জমি কেড়ে নেওয়ায় ওনারা আদতে কতটা কষ্টে আছেন। হতেই পারে সেদিন কাশ্মীরের ভাই-বোনেরা নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হবে। আর্টিকেল ৩৭০ এর বিলুপ্তি একটা ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে। এটা গোটা ভারত এবং কাশ্মিরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে। লাদাখ অঞ্চলে চীনা আগ্রাসনের কথা মাথায় রেখে আজ আমাদের ভারত এবং জম্মু-কাশ্মীরে মধ্যে সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর ভেঙে ফেলা উচিত।

(তথ্যসূত্র:- অর্গানাইজার, ২৭.০৬.১৯৬০)

২.৭ ধারা ৩৭০ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সংসদে ঐতিহাসিক ভাষণের কিছু অংশ (৩০.০৮.১৯৬৮)

জম্মু কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অংশ হলেও আজ এর আলাদা সংবিধান আছে, আলাদা রাজ্যাধক্ষ আছে এবং আলাদা পতাকা আছে। আমার মনে হয় অসঙ্গতিপূর্ণ এই অবস্থা এক্ষুনি শেষ করে দেওয়া দরকার।

জম্মু-কাশ্মীর কে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সাথে সমান্তরালভাবে একই অবস্থায় আনা উচিত। এই উদ্দেশ্যে সংসদের কাছে আমার নিবেদন যাতে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলুপ্ত করার সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শুরু করা যায়।

জম্মু কাশ্মীরের সংবিধান আজও আলাদা। জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিভক্ত অংশ, কিন্তু আজও ওই রাজ্যের মানুষের পৃথক নাগরিকত্ব আছে। কাশ্মীরকে আমরা ভারতমাতার

মুকুট বলি কিন্তু কাশ্মীরের আলাদা পতাকা আছে। আমি জানতে চাই এসবের কারণটা ঠিক কি?

এই সংবিধান যদি দেশের পঞ্চাশ কোটি মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারে তবে কেন তা জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের জন্য হিতকারক নয়! আমরা কি ক্রমশ পিছনের দিকে এগিয়ে চলেছি? আমরা কি চাইছি ১৯৫৩ সালের পূর্ববর্তী সেই অস্থির সময় আবার ঘুরে আসুক? কাশ্মীরকে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়াটা একটা দেশবিরোধী পদক্ষেপ যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক।

সংবিধান সভার সদস্যদের মনস্কামনা পরিষ্কার ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন এই ধারা কিছুদিনের জন্যই থাকবে। পন্ডিত নেহেরু বারবার বলতেন ধীরে ধীরে এই ধারা মুছে ফেলা হবে। কিন্তু আজ এতদিন পরেও এই অনুচ্ছেদ বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে। আপনারা বলতেই পারেন আজ এই আর্টিকেল শেষ করার সঠিক সময় নয়। কিন্তু আমি তো স্বপ্নেও এমন দিনের কল্পনা করতে পারছিনা যেদিন অস্থায়ী ৩৭০ ধারা স্থায়ী হয়ে যাবে।

আমরা কি পাকিস্তানের জন্যই অনুচ্ছেদ ৩৭০ রেখে দিয়েছি? সে তো যখনই আপনারা নতুন কোন আইন তৈরি করুন তখনই পাকিস্তান চিৎকার করতে থাকে। ওদের কাজই এটা। কিন্তু যদি ভারতের অখন্ডতা পাকিস্তানের চিৎকার-চেঁচামেচিতে থেমে যায় তো বলতে হবে আজ বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। আমরা জম্মু-কাশ্মীর বিষয়ে পাকিস্তানকে কোন পক্ষ মানি না।

কাশ্মীর ইস্যু আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুরক্ষা পরিষদে বিচারাধীন। পাকিস্তান রোজ রোজ আমাদের ক্ষতে আঘাত করে ঘা সৃষ্টি করতে চায়। তাই আজ কাশ্মীর এবং ভারতের জনগণের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিভেদ দূর করে ভারতের অখণ্ডতা প্রমাণ করার সময় এসেছে, যাতে করে এইসব বাধার আমরা সম্মুখিন হতে পারি।

পর্ব - ৩

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় ৩৭০ ধারার উপর সংবিধান সংশোধনী বিলের বিষয়ে আলোচনা

৩.১ ১৯৬৪ সালে ঐতিহাসিক ৩৭০ ধারা সংক্রান্ত সংশোধনীর উপর বিতর্ক

১৯৬৪ সালের এগারোই সেপ্টেম্বরের বিজনৌরের নির্দল সাংসদ প্রকাশ বীর শাস্ত্রী আর্টিকেল ৩৭০ বিলোপের জন্য এক প্রাইভেট বিল সংসদে পেশ করেন যার উপর বেশ লম্বা-চওড়া আলোচনা হয়েছিল। ধারা ৩৭০ বিলোপের এই ঐতিহাসিক বিলকে সেদিন রাজনীতির উর্ধে উঠে সমর্থন করেছিলেন রামমোহন লোহিয়া, কে হনুমানথাইয়া, এনসি চাটার্জী, সরযু পান্ডে, লোকনায়ক বাপুজী এমএস অ্যানি, মিস্টার ইন্দ্রজিৎ মালহোত্রা, ভগবত ঝাঁ, আব্দুল গনির মত বিখ্যাত সাংসদেরা। জনসংঘের সাংসদেরা ছাড়াও অনেক নির্দল সাংসদ মনে করতেন ধারা ৩৭০ জম্মু কাশ্মীর রাজ্য এবং দেশের জন্য যথেষ্ট বিপদজনক। আজ এই নবপ্রভাতে তাই তাদের কথা মনে করা দরকার যারা সেদিন সরাসরি এই বিলের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল রাজনীতির উর্ধে উঠে সেদিন একাধিক কংগ্রেস সাংসদ, জম্মু-কাশ্মীরের সাংসদরা, বামপন্থীদের একাংশ এবং সমাজবাদী নেতাদের সাথে অনেক নির্দল সাংসদ এই ধারা প্রত্যাহারে পক্ষে ছিলেন। যারা মনে করতেন অস্থায়ী এই ধারা অবিলম্বে বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন -

১. শ্রী প্রকাশ বীর শাস্ত্রী (নির্দল)
২. এইচ ভি কামাত (সোস্যালিস্ট পার্টি)
৩. রামমোহন লোহিয়া (সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি)
৪. এন সি চ্যাটার্জি (সিপিআই সমর্থিত নির্দল)
৫. হনুমানথাইয়া (কংগ্রেস)
৬. শ্রী সরযু পান্ডে (সিপিআই)
৭. শ্রী ভগবত ঝাঁ আজাদ (কংগ্রেস)
৮. ইন্দ্র জে মলহোত্রা (কংগ্রেস)
৯. শ্রী এস এম ব্যানার্জী (সিপিআই সমর্থিত নির্দল)
১০. সামলাল শ্রাফ (কংগ্রেস)
১১. ডিসি শর্মা (কংগ্রেস)
১২. আব্দুল ঘণি গণি (ন্যাশানাল কনফারেন্স কংগ্রেস)
১৩. এস এস মোর (কংগ্রেস)
১৪. সি কে ভট্টাচার্য (কংগ্রেস)
১৫. এমএস অ্যানি (নির্দল)
১৬. শ্রী গোপাল দত্ত মঞ্জি (কংগ্রেস মনোনীত)

৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়ালেন সাংসদ শ্রী প্রকাশ বীর শাস্ত্রী

১৯৬৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের নির্দলীয় সংসদ পণ্ডিত প্রকাশ শাস্ত্রী ধারা ৩৭০ বিলোপের জন্য বিল পেশ করেন। বিল পেশ করার সময় উনি বলেছিলেন, "দেশ, দল এবং ভোটের অনেক উপরে। আমরা আসবো যাবো। কিন্তু যদি এই ঐতিহাসিক ভুল আজ শুধরে নেওয়া না হয় তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না"।

ধারা ৩৭০ অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিল

ধারা ৩৭০ অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিল সংসদে পেশ করার সময় পন্ডিত প্রকাশ বীর শাস্ত্রী বলেন, "জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ধারা ৩৭০ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। আর যখন আমি এই বিল সংসদে পেশ করছি তখন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে কিভাবে সাতচল্লিশ সালে অনুপ্রবেশকারীদের সাথে পাকিস্তানী সেনা উপত্যকায় এসেছিল। কিভাবে মাসের পর মাস রক্তস্রোতে ভেসে গিয়েছিল ঝিলাম নদী। সব থেকে বড় কথা একা সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সাড়ে পাঁচশোর উপর দেশীয় রাজ্যকে একফোঁটা রক্তপাত ছাড়াই ভারতীয় ইউনিয়নে সামিল করেছিলেন। সেটাও খুব কম সময়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সরকার সতেরো বছরেও জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করতে পারল না"।

জম্মু-কাশ্মীরের বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করে তিনি বলেন, "সরকার সংবিধান সভাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে এই ধারা ধীরে ধীরে দুর্বল করা হবে এবং একসময় বিলোপ করে দেওয়া হবে। বুঝতে পারছি না পন্ডিত নেহেরু এবং গোপাল স্বামী আয়নগরের এই আশ্বাসের পরেও আজও কিভাবে শুধুমাত্র একটি ধারা সংবিধানের ঐক্যকে নষ্ট করছে। আর আজ যদি এই ভুল শুধরে নেওয়া না হয় তবে ভবিষ্যতে এই সমস্যা তীব্রতর রূপ ধারণ করবে"।

৩৭০ ধারার পার্শপ্রতিক্রিয়া

জম্মু-কাশ্মীরে আর্টিকেল ৩৭০ চালু থাকার সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে প্রকাশ বীর শাস্ত্রী বলেন,"এই ধারা থেকে যাওয়ার সবচেয়ে বড় পার্শপ্রতিক্রিয়া হল যে পাকিস্তান আজ দেশে দেশে ভারতের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করছে। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য দেশ যারা ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে ততটা ওয়াকিবহাল নয় তারা পাকিস্তানের কথা শুনে ভাবছে এটি কোন অস্থায়ী ব্যবস্থা নয় বরং জম্মু-কাশ্মীরের জন্য একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত"। তিনি আরো বলেন, "এই ধারা জম্মু-কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির ব্যবস্থা নয়। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আমার বিলকে গ্রহণ করুক এবং অবিলম্বে সংবিধান থেকে এই ধারা মুছে দিক"।

রামমোহন লোহিয়া (সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, ফারুকাবাদ)

যতদিন আর্টিকেল ৩৭০ থাকবে ততদিন ভারত এবং জম্মু কাশ্মীর সার্বিকভাবে এক

হতে পারবে না। অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের অনুরোধ রেখে লোহিয়া বলেন কাশ্মীর বিষয়ে জনসাধারণের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করা প্রধানমন্ত্রীর উচিত নয়।

এই ধারা থাকলে ভবিষ্যতে এমন এক কালবৈশাখী নেমে আসবে যার সম্মুখীন হওয়া সত্যিই কঠিন।

অসাম্যের এই ধারা শেষ তা ভারতের জনগণ এবং সংবিধানের প্রতি প্রকৃত ন্যায় বিচার হবে।

এই কয়েক বছরে ভারত সরকারের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো হয়েছে। একটা পা থাকা দুর অস্ত, এর দুটো পা-ই আজ হারিয়েছে।

সত্যি বলতে কি সরকারের এ বিষয়ে আর বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে আগামীতে পাকিস্তানের সরকার এবং জনগণের মনে এই ধারণা আসতেই পারে যে কাশ্মীর আদতে তাদের অধিকার। এবং যদি এরকম ভাবনা ভবিষ্যতে এসে থাকে তবে আমি এই সরকারকেই তার জন্য পুরোপুরি দোষ দেব।

শ্রী গোপাল দত্ত মঞ্জি (কংগ্রেস মনোনীত সাংসদ, জম্মু-কাশ্মীর)

সত্যি বলতে কি ভারতের সংবিধান ওখানে পুরোপুরি লাগু হওয়া উচিত আর যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বাকি ভারতের মানুষেরা পান তা পুরোটাই ওখানকার মানুষের পাওয়া উচিত।

আমার মতে ৩৭০ জম্মু-কাশ্মীরের জন্য একটা লজ্জা। যারা বিশ্বাস করেন যে এটি একদিন আইনে পরিণত হবে এবং জম্মু-কাশ্মীরের উন্নতিতে সাহায্য করবেন তারা আদতে ভুল। চোদ্দ বছর সংসদে কাটানোর পর বলতে বাধ্য হচ্ছি আর্টিকেল ৩৭০ এর জন্য জম্মু কাশ্মীর বাকি ভারতের চেয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে আর দুর্বল হয়েছে।

আমি আপনাদের জম্মু কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে চাই। এটা সত্যি যে জম্মু-কাশ্মীর দিনে দিনে বাকি ভারতের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। তাই এই ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন যাতে ওখানকার মানুষ একটা সুষ্ঠু জীবনযাত্রা পালন করতে পারে।

শ্রী সরযু পান্ডে (সিপিআই, রাসরা)

জম্মু-কাশ্মীর বিষয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের নীতি ভুল ছিল আর এই নীতির কারণেই গোটা দেশের সার্বিক ঐক্য সম্ভব হয়নি। আমি আর গোটা ভারতের আপামর জনগণ এ ব্যাপারে সহমত হবো যে ব্রিটেন ও আমেরিকার কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলে ভাবে না। সরকার সব জানে, তবু হাত গুটিয়ে বসে আছে।

তাই আমার মনে হয় আমাদের কিছু করা উচিত। এটাই সঠিক সময়। অনেক আগেই এটা করা যেত, কিন্তু হয়নি যখন তখন অবিলম্বে এই ধারা প্রত্যাহার করা উচিত। কাশ্মীর বিষয়ে ভারত সরকারকে তাদের নীতি পরিষ্কার করতেই হবে।

শ্রী ভগবত ঝাঁ আজাদ (কংগ্রেস, ভাগলপুর)

আমি পন্ডিত প্রকাশ বীর শাস্ত্রীর আনা বিলকে পুরোপুরি সমর্থন করি।

বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার ফলে কাশ্মীর কিছু তো পায়নি, উল্টে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আজ পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয়নি কারণ আমরা আমেরিকা-বৃটেনের দিকে তাকিয়ে আছি ওরা তাকিয়ে আছে শেখ আব্দুল্লাহর দিকে।

অবিলম্বে ভারত সরকারের উচিত তার কাশ্মীর নীতি পরিষ্কার করা। কিসের জন্য প্রধানমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন?

শ্রী এস এম ব্যানার্জী (সিপিআই সমর্থিত নির্দল, কানপুর)

বন্ধু শ্রী প্রকাশ বীর শাস্ত্রী যে বিল আজ এই হাউসে এনেছেন আমি তার সমর্থনে বলতে উঠেছি। আমি বুঝতে পারছি যেভাবে এই কক্ষের সাংসদরা, বিশেষত কাশ্মীরের সদস্যরা যেমন গনি সাহেব এবং অন্যান্যরা, এই বিতর্কে অংশ নিয়েছেন তা আদতে কাশ্মীরেরই আওয়াজ। কাশ্মীর কি চায় তা আজ আমাদের আর বুঝতে বাকি নেই।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করে আমার মনে হচ্ছে কাশ্মীরকে পুরোপুরিভাবে ভারতের অংশ করে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আর দেরী করা উচিত নয়। আমাদের প্রকাশ্যে বলতে হবে যে কাশ্মীর ভারতের। ভারতের ছিল আর ভবিষ্যতেও ভারতেরই থাকবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয় বলেই আমার মনে হয়।

আজ যদি গোটা দেশের সামনে এই বার্তা যায় যে সরকার ৩৭০ ধারা বিলোপ ঘটাতে পারে না, তাহলে কাশ্মীরকে একটা হাইকোর্ট বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিলেও তা ভবিষ্যতের জন্য একটা বড় ভুল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পাকিস্তানের ভোট হয়ে গেছে আর যদি ওখানকার লোকজন ভুল করেও আইয়ুব শাহীকে রেখে দেয় তো আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এটা পাকিস্তান এবং চীনের একটি গুরুতর চক্রান্ত। এটাকে নিয়ে কাশ্মীর ইস্যু কে আবার সামনে তোলা হবে। হতেই পারে যে এ রকম পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে কাশ্মীরকে ভারতের অংশ রাখতে বলপ্রয়োগ ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো রাস্তা পড়ে থাকবে না - কাশ্মীরের জন্য যা মোটেই ভালো হবে না।

ইন্দ্র জে মলহোত্রা (কংগ্রেস, জম্মু)

রাজ্যের লোকেরাও অনুচ্ছেদ ৩৭০ নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। আমি তাই সম্পূর্ণরূপে এই বিলের সমর্থন করছি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিলের বিরোধিতা করা উচিত নয়। যদি তিনি এক্ষুনি এই বিলকে সমর্থন করতে তৈরী না থাকেন তবে তিনি আমাদের আশ্বাস দিন যে আগামী অধিবেশনে এই বিল আনা হবে এবং ধারা ৩৭০ কে চিরতরে শেষ করে দেওয়া হবে।

এইচ ভি কামাত (সোস্যালিস্ট পার্টির সাংসদ, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবি এবং পরবর্তীতে জনতা পার্টির সাংসদ। ভূতপূর্ব সংবিধান সভার সদস্যও)।

আমি আর আমার পার্টি সহকর্মীরা ১৯৬২ সালের আগস্ট মাস থেকে এই বিষয়টা সংসদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মানে আজ প্রায় দু বছর হয়ে গেল। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন আমাদের এক সদস্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে জম্মু কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তিতে কোন সাংবিধানিক সমস্যা আছে কিনা তখন গৃহ মন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে সেরকম কোন সমস্যা নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ধীরে-ধীরে জম্মু-কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং এই অসাম্য ভরা ধারা কে তুলে দেওয়া হবে। এটা ১৯৬২ সালের কথা। পরের বছরও আমরা সেই একই প্রশ্ন তুলেছিলাম। এবং তার পরের বছরও। যখন বারবার এই বিষয়টা সংসদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছিল তখন তৎকালীন গৃহ মন্ত্রী এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আর (সেই সময়ের) প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী এবং বর্তমান সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা দুজনই নিজের মতো করে জানিয়েছিলেন যে এক্ষুনি এই ধারার বিলুপ্তি করা হবে না। কিন্তু এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে ধীরে ধীরে এই অনুচ্ছেদ এক স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। শুধু তাই নয় শিক্ষা মন্ত্রী যখন মাস দুয়েক আগে কাশ্মীর গিয়েছিলেন তখন তিনিও এই একই কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি এই ধারার বিলুপ্তির পক্ষে আর তিনি চান যাতে জম্মু-কাশ্মীর সম্পূর্ণভাবে ভারতের অংশ হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ বলা যায় যে মন্ত্রিসভায়, বা কংগ্রেস দলে, বা এই সংসদে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই ধারা জম্মু-কাশ্মীরে হাজারো সমস্যার কারণ। যদি এই ধারাকে মুছে ফেলা হয় তবে রাজ্যের ঠিক ততটাই লাভ হবে যতটা লাভ অন্য রাজ্যগুলোর হয়। গোটা ভারতের সাথে এক নিবিড় সংযোগের কারণে জম্মু-কাশ্মীর ঠিক ততটাই উপকৃত হবে যতটা মহীশূর, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র বা মধ্যপ্রদেশ হয়।

সামলাল শ্রাফ (কংগ্রেস, জম্মু-কাশ্মীর থেকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য। প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী)

সততার সাথে খুব সচেতনভাবে আমি একটা কথা বলতে চাই যে শেষ সতেরো বছরে অন্য আর পাঁচটা রাজ্যের সঙ্গে একই লাইনে আসতে না পারার কারণে রাজ্য যথেষ্ট ভুগেছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০কে রেখে দিয়ে, আর পাঁচটা রাজ্যের থেকে জম্মু কাশ্মীর কে পৃথক করে কি লাভ হচ্ছে বলতে পারেন? আমি বলছি। প্রথমত সেখানকার মানুষের মনে কাজ করছে এক তীব্র নিশ্চয়তা। দ্বিতীয়ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মুষ্টিমেয় স্বার্থপর মানুষের, হতেই পারে তারা আমার সহকর্মী, নোংরা স্বার্থের জন্য ভুগতে হচ্ছে রাজ্যের আপামর জনগণকে। এটা আমি সাংসদ হিসেবে বলছি না, আমি একজন সাধারন মানুষ হিসেবে বলছি। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো একটি যথাযথ বিল এনে মুছে ফেলা হোক এই আর্টিকেলটি - শেষ করে দেওয়া হোক জম্মু-কাশ্মীরের সব অসাম্যকে।

কে হনুমানথাইয়া (কংগ্রেস, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সংবিধান সভার সদস্য, কর্নাটকের প্রবাদপ্রতীম নেতা, মাইসোর রাজ্যের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী, ব্যাঙ্গালোর থেকে পনেরো বছরের সংসদ এবং কিছুকালের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

১৯৪৯ সালে আমি সংবিধান সভায় ছিলাম। সরকার রাজ্যগুলোর জন্যে মডেল সংবিধান তৈরি করতে একটি কমিটি ঠিক করে দিয়েছিল। আমি সেখানে সদস্য ছিলাম। আমরা এমন এক মডেল সংবিধান তৈরি করতে চাইছিলাম যা ভারতীয় রাজ্যগুলো গ্রহণ করতে পারে। কয়েক মাস পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম রাজ্যগুলোর জন্য পৃথক সংবিধানে দরকার নেই এবং গোটা ভারতের জন্য এক এবং অভিন্ন সংবিধান থাকবে। সেই মতো আমরা আমাদের সুপারিশ পেশ করেছিলাম। যখন আমরা, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিরা, নিজেদের সুপারিশ পেশ করলাম সর্দার প্যাটেল খুব খুশি মনে তা গ্রহণ করেছিলেন।আমরা ভেবেছিলাম কাজ হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেখলাম সংবিধান সভার কাশ্মীরি প্রতিনিধিরা খুব উৎসাহ সহকারে ধারা ৩৭০ কে সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির পক্ষে রায় দিচ্ছেন। ধারা ৩৭০ ভারত এবং জম্মু কাশ্মীরের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে বর্তমান বিল তা মুছে দিতে চায়। দেখে ভালো লাগছে কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবকে খোলামনে সমর্থন করছেন। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যার বিশ্লেষণ করে এই বিল কে গ্রহণ করতে। শুধুমাত্র কাশ্মীর থেকে আসা প্রতিনিধিরাই নয়, দলমত নির্বিশেষে বামপন্থী থেকে দক্ষিণপন্থীরা প্রায় সকলেই এই বিলকে সমর্থন করছে। আমরা সবাই চাই ধারা ৩৭০ মুছে দেওয়া হোক। আজ যখন সারা দেশের মানুষের সাথে প্রায় সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করছে তখন তার বিপরীতে গিয়ে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত মত আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া সরকারের উচিত নয়।

ডিসি শর্মা (কংগ্রেস, গুরুদাসপুর)

যখন আমি এই ৩৭০ নম্বর ধারাটি পড়ি, আমি এই সিদ্ধান্তে এসে ছিলাম যে ছিলাম ভারতের সংবিধানে এই ধারা এক চরমতম অসাম্যের সৃষ্টি করেছে। বন্ধুরা প্রিয় সাথী শ্রী গোপাল দত্ত মঞ্জি বলেছেন ধারা ৩৭০ হল একটি দেওয়াল। আমার মনে হয় না এটি একটি দেওয়াল।যদি এটি একটি দেওয়াল হত তবে এটিকে কিছুদিন বাদে সহজেই ভেঙে ফেলা যেত। আমার মনে হয় এটি একটি বৃহৎ প্রাচীর যা ভারত এবং জম্মু-কাশ্মীর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও আমরা বানিহাল টানেল তৈরি করে উপত্যাকা সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের ভৌগোলিক যোগাযোগ সৃষ্টি করেছি, তবু আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে আমাদের ধারা ৩৭০ নামক দুর্ভেদ্য পর্বতকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। এমন এক ডিনামাইট যা মানুষের ভালোর জন্য ব্যবহার হবে, যা উপত্যকার মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে কাজে লাগবে।

আব্দুল ঘণি গণি (ন্যাশানাল কনফারেন্স কংগ্রেস, জম্মু ও কাশ্মীর)

এটি (আর্টিকেল ৩৭০) একটি অন্তর্বর্তীকালীন এবং অস্থায়ী ব্যবস্থা যা যেকোনো সময় দূর করে দেওয়া যেতে পারে। আমি এই কক্ষের সমস্ত সদস্যদের ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ করবো যাতে তারা এই বিল পাস করে ধারা ৩৭০ মুছে দিতে সাহায্য করে। শুধু বিরোধী দলের সদস্যদের নয়, কংগ্রেসের সদস্যদের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে তারা যাতে এই বিল পাস করে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের সমনাগরিকত্বের সুযোগ দেয়। এই কক্ষের প্রত্যেকেই চাইছেন ধারা ৩৭০ কে উঠিয়ে দিতে। পন্ডিত জি বলেছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীজি বলেছেন, এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও নিরাপত্তা পরিষদে একথা বলেছেন। তাহলে কেন এখনও এই ধারা এখনও ভারতীয় সংবিধানের উপর বোঝা হয়ে থাকবে! এই ধারা তুলে দিলে আমাদের হাজারো রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাছাড়া এই বিল পাস হলে তা শুধুমাত্র আমাদের শত্রুদের কাছে একটা কড়া জবাব হবে না, তা পাকিস্তান সমেত সমস্ত ভারত বিরোধী শক্তি যারা কিনা জাতিসংঘে বা অন্যত্র ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলে,তাদের জন্য এক যোগ্য জবাব হবে। তাই গণতন্ত্রের নামে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই সংশোধনী বিল গ্রহণ করে করে করে জম্মু-কাশ্মীরের অসাম্যকে চিরতরে মিটিয়ে ফেলতে।

এন সি চ্যাটার্জি (বর্ধমান থেকে নির্বাচিত সিপিআই সমর্থিত নির্দল, হিন্দু মহাসভার নেতা, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রাক্তন সহযোগী, লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চ্যাটার্জির বাবা)

সরকার বলছে, "আমরা পুরোপুরি এই দাবিকে সমর্থন জানাই। এটি কোন সাম্প্রদায়িক দাবি নয়। এটি কোন রাজনৈতিক দাবিও নয়। বরং এটি একটি জাতীয় দাবি এবং জাতির স্বার্থে নিয়োজিত সময়োপযোগী এক চাহিদা।" তবুও আমি বুঝতে পারছি না এত কিছুর পরেও সরকার কেন এখনও এই বিল পাস হতে দিচ্ছে না।

আমার হাতে ১৯৬৩ সালের ২৯শে নভেম্বর প্রকাশিত হওয়া হিন্দুস্থান টাইমসের একটি রিপোর্ট আছে। যেখানে বলা হচ্ছে, "ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা মিস্টার সাদিক আজ স্বীকার করেছেন জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে আইনের শাসন নেই। আর দুর্নীতি গোটা শাসন ব্যবস্থায় ছেয়ে গেছে।" খুব ভালো বলেছেন তিনি। কিন্তু এবার দেখুন তার পরের বক্তব্য। "মিস্টার সাদিক, যিনি কিনা জম্মু-কাশ্মীরের শাসকদল ন্যাশনাল কনফারেন্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এক ইন্টারভিউতে বলেছেন জম্মু-কাশ্মীরের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে ধারা ৩৭০ অবিলম্বে তুলে দেওয়া উচিত।" আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে জম্মু-কাশ্মীরের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে দিতে, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং সার্বিকভাবে রাজ্যকে ভারতীয় ইউনিয়নের শামিল করতে আজ এই ধারা তুলে দেওয়া দরকার। আমাদের আর দেরি করা উচিত না। এটি ভারতীয় সংবিধানের একুশতম অংশের অধীনে

একটি অস্থায়ী ধারা। সুতরাং আর্টিকেল ৩৭০ ভারতীয় সংবিধানের স্থায়ী অংশ নয়। কত দিন অব্দি আমরা এক অস্থায়ী ব্যবস্থা কে টেনে নিয়ে চলবো? আজ যদি প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত থাকতেন তবে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম তাঁর ডিকশনারিতে "অস্থায়ী" শব্দের মানে কি!

শুধু একটা আইনের কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাইবো। আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র একটি পাবলিক নোটিশ জারি করে ধারা ৩৭০কে তুলে দিতে পারেন। তাহলে আমরা কেন এখনো দেরি করছি? কোথায় সমস্যা!

এস এস মোর (কংগ্রেস, পুনে)

যে বিল আজ সংসদে উত্থাপিত হয়েছে বিনাশর্তে আমি তার উপর পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আর্টিকেল ৩৭০ আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি বুঝতে পারছি না এই ধারা সংবিধানে থাকার অর্থটা কি! আমি ওকালতি করি। কিন্তু একজন উকিল হিসাবেও এই ধারা থাকার যৌক্তিকতা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আমার আগের বক্তারা বলেছেন এই ধারা চিনা প্রাচীরের মত ভারত এবং কাশ্মীরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একদম ঠিক বলেছেন ওনারা। ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন আর্টিকেল এবং শিডিউলের মধ্যে এই ধারা সত্যিই এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আছে। আর যখন আমরা সংসদে দাঁড়িয়ে সংযুক্ত ভারতের কথা বলছি, তখন মনে হয় না কাশ্মীর এবং অন্যান্য রাজ্য, এই যেমন ধরুন মহারাষ্ট্র বা মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত। তাই আমার মনে হয় যে এটাই সঠিক সময় যখন অনুচ্ছেদ ৩৭০ চিরতরে শেষ করে দেওয়া দরকার।

সি কে ভট্টাচার্য (কংগ্রেস, রায়গঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ)

চেয়ারম্যান স্যার, দু"বছর আগে নভেম্বর মাসে শ্রীনগরে যখন সম্পাদকদের সমাবেশ চলছিল তখন আমি, বকশি গোলাম মহম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী একই মঞ্চে ছিলাম। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভারতেরই অংশ থাকবে।
শুধু একবার নয় বারবার তিনি একই কথা বলেছিলেন। তাই আমার মনে হয় না এটা নিয়ে কোন বিতর্ক থাকা উচিত যে ৩৭০ এবার আস্তাকুঁড়ে চলে যাওয়া প্রয়োজন।

তাই যদি আজ কাশ্মীরের ব্যাপারে আমাকে বলতে হয় তো আমি আবার বলব কাশ্মীর ছাড়া ভারত হতে পারে না এবং ভারতের বাইরে কোন কাশ্মীর থাকতে পারে না। কাশ্মীর আমাদের জীবন, আত্মা এবং সংস্কৃতির অংশ - সর্বক্ষেত্রে।

তাছাড়া আমাদের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী যখন বারবার বলেছেন যে সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে এই অনুচ্ছেদ শেষ করে দেওয়া হবে তখন আমার মনে হয় আমাদের আর দেরি করা উচিত না। আজ যদি সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে এই বিলের সমর্থন করে ধারা ৩৭০ কে মুছে ফেলা হবে তবে তা পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকেই সমর্থন জানানো হবে।

লোকমান্য বাপুজি এমএস অ্যানি (নির্দল সাংসদ, বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ, বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত, লোকমান্য তিলকের রাজনৈতিক শিষ্য, কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত, বিহারের রাজ্যপাল এবং পরবর্তীতে তৃতীয় লোকসভার সদস্য)

কিছু সুবিধা এবং তাৎপর্যপূর্ণতার ভিত্তিতে তখন একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল কাশ্মীরের জন্য। বারবার বলা হয়েছিল এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৩৭০ কিছু প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আসা এক অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র।

"অস্থায়ী" শব্দেরও কিছু অর্থ আছে। একটা "অস্থায়ী" ব্যবস্থা এক বছরের জন্য চলতে পারে। দুবছরের জন্য চলতে পারে। তিন বছরের জন্য চলতে পারে। এমনকি পাঁচ বছরের জন্যও চলতে পারে। কিন্তু যদি সেটা বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ চলতে থাকে তখন সেটি আর অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকে না, সেটিকে "স্থায়ী ব্যবস্থা" বলা হয়। সতেরো বছর সময়টা কোন ছেলে খেলা নয়। এই সতেরো বছরে আমরা দেশের জন্য অনেক আইন তৈরি করেছি। কিন্তু যতবার আমরা আইন তৈরি করেছি ততবার এটাই বলেছি "এটা সারা ভারতে প্রযোজ্য কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে নয়।" আমরা যতবার গোটা দেশের জন্য একটা আইন তৈরি করেছি ততবার বলেছি এটি জম্মু-কাশ্মীরের সীমানায় খাটবে না। সত্যিই কি এটা ওখানকার মানুষদের সাথে সৌহার্দ্য রাখার একটা উপায়! আমরা কি ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছি না যে "তোমরা ভারতের অংশ, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের নিজেদের লোক বলে মানতে পারছি না।" এই ব্যবস্থা গোটা ভারতের সাথে সাথে কাশ্মীরিদের জন্যও ক্ষতিকর।

বন্ধু শ্রী খাদিলকর (আর কে খাদিলকর, কংগ্রেস, খেড়, মহারাষ্ট্র) বলছিলেন আমাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। আমার মনে হয় আমরা তাড়াহুড়ো করছি না, বরং বড্ড ধীর গতিতে চলছি। আপনার কাছে এটি তাড়াহুড়ো মনে হতে পারে কিন্তু কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ বা আপামর ভারতবাসীর কাছে এটা কোনভাবেই তাড়াহুড়ো নয়। জনতা জানে কাশ্মীর এবং ভারত অবিভাজ্য, অবিভক্ত দুই অংশ। তাই আমি অনুরোধ করছি যে বিল আজ সামনে আনা হয়েছে আমরা সবাই মিলে সেই বিলকে সমর্থন করে আইনে পরিণত করতে সাহায্য করি।

৩.২ জম্মু-কাশ্মীর এবং ধারা ৩৭০ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন:- অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিষয়ে ঠিক কি কি পরিবর্তন করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয় নি?

উত্তর:- যদিও বিগত বছর গুলিতে ধারা ৩৭০ এ কয়েকটি ছোটখাটো পরিবর্তন আনা হয়েছে কিন্তু সেগুলো মূল ইস্যু থেকে বেশ অনেকটা দূরে। ঘটনা হল ৩৭০ বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার শিকড়। সেই শিকড়কে কেটে ফেলার কোনো চেষ্টা করা

হয়নি। তাছাড়া এক বিশাল ক্ষেত্র শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অধিকারসীমায় আসে। সংবিধানের যৌথ তালিকার বিষয় গুলি এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের নাগরিক জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিক নয়। এমনকি বহু বছর ধরে যারা জম্মু-কাশ্মীরে বসবাস করছে তারাও সেখানকার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। এমন অনেকে আছে যারা রাজ্য বিধানসভা বা স্থানীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দান করার অধিকার পায় না। এমনকি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের কোন মহিলা যদি অন্য রাজ্যের কোন পুরুষকে বিয়ে করে তবে সে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এই অসাম্য গুলো বরাবরই ৩৭০ নম্বর ধারার সৌজন্যে সংবিধানে থেকেই গিয়েছিল।

প্রশ্ন:- কাশ্মীরে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার ব্যাপারে অতিউৎসাহী কিছু মানুষ মিডিয়ায় বরাবর প্রশ্ন করে, ধারা ৩৭০ই কেন একটা ইস্যু হবে? ৩৭১এ, ৩৭১জি বা এরকম অন্য ধারা গুলো নয় কেন?

উত্তর:- আসলে এটা একটা খুবই আজগুবি প্রশ্ন। অনুচ্ছেদ ৩৭১এ, ৩৭১জি এবং এরকম অন্য কয়েকটি ধারার সাথে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এর বিশেষ ব্যবস্থা গুলো গুলিয়ে দিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি করার সমান্তরাল প্রচেষ্টা ছাড়া এ প্রশ্ন আর কিছুই না। জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া অন্য রাজ্যে কোন আলাদা সংবিধান নেই, কোন আলাদা নাগরিকত্বের ব্যাপার নেই। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার গুলো জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া আর সব রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া নির্বাচনক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতাও শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরেই প্রযোজ্য ওই একটি বিশেষ ধারার সুবাদে।

প্রশ্ন:- আপনার কি মনে হয় অনুচ্ছেদ ৩৭০ নঙর্থক মানসিকতায় পরিপূর্ণ? আপনার কি মনে হয় এই ঋণাত্মক মানসিকতাই কিছু বিশেষ পরিবারের কুলীন বর্গের রাজনেতাদের বাকি রাজ্যকে শোষণ করতে সাহায্য করছে? এই মনোভাবই কি কিছু হীনমন্য নেতার সংকীর্ণ মানসিকতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য দারিদ্র এবং অশিক্ষা মুক্ত ভারতীয় সমাজ তৈরীর বিরোধিতা করছে?

উত্তর:- অবশ্যই। কিন্তু এর উত্তর বুঝতে গেলে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে। গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যাবে ধারা ৩৭০ আসলে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই না। ধারা ৩৭০ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে মনে হয় কাশ্মীরি মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং শিক্ষাগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় সংবিধান যথেষ্ট উদার, মানবিক বা বুদ্ধিদীপ্ত নয়। মনে হয় যেন কাশ্মীরে মুসলিমদের অধিকার শুধুমাত্র ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদের দ্বারা তৈরি এক অন্তরিত দেওয়াল দ্বারাই সুরক্ষিত হতে পারে - আর কিছুতে নয়।

আচ্ছা, এই ভারতীয় ইউনিয়নেরই বিভিন্ন রাজ্য, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম বা গুজরাটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত নয়! যদি তাই হয় তবে ওই একই সংবিধান কেন কাশ্মীরের নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবে

না? কাশ্মীরিয়ত্ নামের জিগির তুলে আলাদা সংবিধানের দাবি তবে কেন? সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন, সিএজির অধিকারক্ষেত্র কেন কাশ্মীর সীমানার ওই পিড়পাঞ্জাল পর্বত শ্রেনীতেই গিয়ে আটকে যাবে! কাশ্মীরের মানুষের কি অধিকার নেই ন্যায্য বিচার পাওয়ার? কাশ্মীরের জন্য যে বিপুল অর্থ কেন্দ্র প্রতি বছর বরাদ্দ করে তার যথাযথ ব্যবহার যাতে হয় সেটা দেখা কি কেন্দ্রের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়া উচিত নয়? কেন সেখানকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটা স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে না? বিধানসভা কেন্দ্রের একটাই ডিলিমিটেশন কমিশন সারাদেশে কাজ করলেও জম্মু-কাশ্মীরের জন্য কেন পৃথক কমিশন থাকবে? রাজ্যের প্রধান এবং সরকারের প্রধানের আলাদা আলাদা নাম কিভাবে একজন সাধারণ কাশ্মীরির উপকারে আসতে পারে? ভাবুন তো কি হতে পারে যদি শুধুমাত্র নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতীয় সংসদের হাতে থাকে এবং বাকিটা রাজ্য বিধানসভার হাতে থাকে? সেক্ষেত্রে একটা রাজ্য চালানোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তার সংস্থান জম্মু-কাশ্মীর সরকার কিভাবে করবে? ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যের খরচের প্রায় ৭৪ শতাংশ অর্থ কেন্দ্র প্রদান করে। কি হবে যদি কেন্দ্রীয় অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৭০ বাধা সৃষ্টি করে? সুরক্ষা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ছোট খাটো ব্যাপারে যদি নজর রাখা না হয় তাহলে কি হতে পারে ভেবে দেখেছেন? ওরা খুব সহজেই ৩৭০ ধারা নিয়ে চিৎকার করতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের গলা দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের বিষয়টা কখনোই বেরোয় না।

তথ্যসূত্র:- **Jagmohan, My Frozen Turbulence in Kashmir, New Delhi, Allied Publisher, 12th revised edition, 2017.**

পর্ব - ৪

অখন্ড ভারতের সঙ্কল্প

জনসঙ্ঘ স্থাপনের সময় থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ বিলুপ্ত করা আর জম্মু-কাশ্মীরে উন্নয়ন এবং শান্তি অব্যাহত রাখার চেষ্টা পার্টি ক্রমাগত করে গেছে। ভারতীয়জনসঙ্ঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি পর্যন্ত এই লম্বা সফরে দল নিজের সিদ্ধান্ত এবং ইস্যুর ওপর দৃঢ়সংকল্প ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অখন্ড ভারতের যে স্বপ্ন সর্দার প্যাটেল দেখেছিলেন এবং যার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নিজের প্রাণের বলিদান দিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন পার্টির অঙ্গীকারের প্রতিটি পাতায় উঠে এসেছে। পার্টি ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ অবলুপ্ত করার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিটি নির্বাচনী ঘোষণাপত্র এবং প্রস্তাবের প্রথম সারিতে বরাবর শামিল করে।

৪.১ ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে হওয়া জনসংঘের প্রথম সর্বভারতীয় অধিবেশনে সর্বভারতীয় সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্যের কিছু প্রধান অংশ

আমরা বিশ্বাস করি জম্মু-কাশ্মীরে সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সমেত গোটা কাশ্মীরের সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের প্রতি আমাদের সংকল্পের প্রমাণ দেয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে শেখ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরের মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ কেন এই সংবিধান কে গ্রহণ করতে ইতস্তত করছে, বাকি ভারতের মুসলিমরা যেখানে এই সংবিধানকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। এই প্রশ্নের আজও কোন সঠিক উত্তর নেই। আমাদের প্রায়ই বলা হয় যে জম্মু-কাশ্মীরে যদি ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করতে হয় তবে উপত্যকার মুসলিমরা ভারত থেকে আলাদা হবার দাবী করবেন। এই যুক্তি সত্যিই দুর্বোধ্য। কারণ আমাদের সংবিধান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ভারতীয় মুসলিমরাও এখানে যথাযথ নিরাপত্তা অনুভব করতে পারে। আমাদের সংবিধানে কোন ধর্মের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে জম্মু-কাশ্মীরের মুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতার কারণ কি। তারা আসলে ভুল বোঝানোর শিকার।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হল জম্মু কাশ্মীরের সংবিধান সভাকে ঘোষণা করতে হবে ওই রাজ্য আইনগতভাবে এবং নীতিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ইউনিয়নে যুক্ত হয়েছে। এর পরের পদক্ষেপ হবে জম্মু কাশ্মীরের সংবিধান সভা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব, মৌলিক অধিকার, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের অধিকার ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত গুলোকে স্বীকার করে সেগুলোর প্রয়োগ করতে শুরু করুক।

৪.২ ধারা ৩৭০ অবলুপ্তি সংক্রান্ত বজ্রকঠিন সিদ্ধান্ত: জনসঙ্ঘ থেকে বিজেপি অব্দি বিভিন্ন নির্বাচনী ঘোষণাপত্র থেকে নেওয়া কিছু বিশেষ অংশ কাশ্মীর

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সিদ্ধান্তগুলোর দিকে নজর দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাঠানো ভারতের চিঠি প্রত্যাহার করতে হবে। গণভোটের কোন

প্রশ্নই উঠতে পারেনা। কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত এই অনিশ্চয়তা চিরতরে শেষ করতে কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির প্রয়োজন, যেমনটা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে হয়েছে। কাশ্মীরকে কোন বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়।

(২১.১০.১৯৫২; দিল্লি, প্রথম সর্বভারতীয় উদ্বোধনী সভা)

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুক্তি এবং ধারা ৩৭০কে শেষ করা

জনসঙ্ঘ স্থিরভাবে বিশ্বাস করে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের কোন কথা বলার অধিকার নেই। ওরা আক্রমণকারী এবং ওদের সাথে ওরকম ভাবেই ব্যবহার করা উচিত। জনসঙ্ঘ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের থেকে মুক্তির সবরকম চেষ্টা চালাবে। জনসঙ্ঘ জম্মু-কাশ্মীরের পৃথক সংবিধানের বিরোধী। চিরতরের জন্য কাশ্মীরকে সুরক্ষিত করার একমাত্র রাস্তা হল আইনগতভাবে এবং নীতিগতভাবে কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা। সংবিধানের ধারা ৩৭০ এক্ষুনি বিলুপ্ত হওয়া উচিত।

(লোকসভা নির্বাচন ১৯৫৭, জনসঙ্ঘের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র)

ধারা ৩৭০; এক মনস্তাত্ত্বিক বাধা

সংবিধানের যে অস্থায়ী অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য পৃথক আইন তৈরি হয়েছিল, সেই ধারা ৩৭০ জম্মু-কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির পক্ষে সব থেকে বড় বাধা। এই একটা ধারাই কাশ্মীরের সাথে অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান তৈরি করেছে। ফলস্বরূপ উপত্যকায় ভারত বিরোধী শক্তি ক্রমশ অক্সিজেন পাচ্ছে। জম্মু-কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পূর্বশর্ত হলো এই ধারার বিলুপ্তি। কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটি তাই আবার ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করছে এই ধারা তুলে নেওয়ার জন্য এবং এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যাতে ভারতীয় সংবিধান পুরোপুরি জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে লাগু করা যায়।

(১৫.০১.১৯৬৬; কানপুর, ভারতীয় জনসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির অধিবেশন)

৪.৩ বিজেপির নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের কিছু অংশ

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এক দেশ

ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের একতা এবং অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখতে দৃঢ়সংকল্প। আমরা বিশ্বাস করি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পুরো ভারত এক এবং অখন্ড। ভাষা, জাতি এবং সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল ভারতীয় একসূত্রে গাঁথা। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে ভারতীয় জনতা পার্টি তাই সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা মুছে ফেলার প্রস্তাব করছে।

(বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহার, ১৯৮৪)

জাতীয় একতা এবং জাতীয় ঐক্য

সংবিধানের অনুচ্ছেদ নাম্বার ৩৭০ মুছে ফেলা হোক

(বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার, ১৯৮৯)

ধারা ৩৭০ মনস্তাত্ত্বিকভাবে আলাদা করে

আমরা ক্ষমতায় এলে সংবিধানের অস্থায়ী ৩৭০ নম্বর আর্টিকেল মুছে ফেলব। এই ধারা সবকিছুর ঊর্ধে উঠে জম্মু-কাশ্মীর কে অবশিষ্ট ভারত থেকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আলাদা করেছে।

(বিজেপির নির্বাচনী ঘোষণাপত্র, ১৯৯১)

সার্বিক ঐক্য

ধারা ৩৭০ জম্মু-কাশ্মীর কে অবশিষ্ট ভারত থেকে আলাদা করে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। আমরা সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে সংবিধান থেকে বিলুপ্ত করব।

(বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহার, ১৯৯৬)

জম্মু-কাশ্মীর

জম্মু কাশ্মীর ভারতের অভিন্ন অংশ ছিল,আছে, থাকবে। ভারত ভৌগোলিকভাবে এক ও অখন্ড ভূমি। ভারতের এই রাজ্যের তিনটি অংশ জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখের দ্রুত উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করবো। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিজের পূর্বপুরুষের মাটিতে সসম্মানে সুরক্ষিতভাবে ফেরত নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারে প্রাথমিকতা হিসাবে স্থান পাবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আসা শরণার্থীদের অনেকদিনের সমস্যা এবং দাবির সমাধান করা হবে। বিজেপি ৩৭০ নম্বর ধারাকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবে। সমস্ত পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এই ধারাকে বিলুপ্ত করার ব্যাপারে বিজেপি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উপত্যকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নত জীবনযাত্রা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পদক্ষেপ করবে।

(বিজেপির নির্বাচনী ঘোষণাপত্র, ২০১৪)

জম্মু-কাশ্মীর এবং ধারা ৩৭০

সমস্ত বাধা দূরে সরিয়ে জম্মু-কাশ্মীরের সব অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সাহায্য করতে আমরা দৃঢ়সংকল্প। আমরা জনসংঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ধারা ৩৭০ মুছে ফেলার ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। আমরা অনুচ্ছেদ ৩৫এ এর অধীনে যে সমস্ত বৈষম্য তৈরি হয়েছে তা মুছে ফেলার চেষ্টা করবো। এতে রাজ্যের যথার্থ উন্নয়ন হবে।

(বিজেপি সংকল্পপত্র, ২০১৯)

পর্ব - ৫

ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিখ্যাত লেখকদের বক্তব্য ও প্রবন্ধসমূহ

এখানে আমরা এই বিষয়ের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং চিন্তাবিদদের লেখা প্রবন্ধের কিছু বিশেষ অংশ দেখব। আশা করা যায় এই প্রবন্ধের অংশগুলো ৩৭০ বিষয়ে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হতে সাহায্য করবে। ৫.১ অসম্ভবকে সম্ভব করলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

(শ্রী অরুন জেটলি, ০৬.০৮.২০১৯)

সংসদের বর্তমান অধিবেশন কার্যকারিতার নিরিখে সবথেকে ফলপ্রসূ এক অধিবেশন হয়ে রইল। ঐতিহাসিক তিন তালাক বিল, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনে কিছু কঠিন ধারার সংযুক্তি এবং ধারা ৩৭০ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো এর মধ্যে প্রধান। মানুষ ভাবত আর্টিকেল ৩৭০ নিয়ে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা বাস্তবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেই ভাবনা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আসলে কাশ্মীর বিষয়ে জনমত এতটাই শক্তিশালী ছিল যে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলও জনমতের চাপে পড়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। এজন্যই রাজ্যসভায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ঐতিহাসিক এক বিল পাশ করিয়েছে ভারত সরকার। আমি এই সিদ্ধান্তের ফল, ইতিহাস এবং জম্মু-কাশ্মীরে এর ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

ব্যর্থ চেষ্টার ইতিহাস

জম্মু কাশ্মীর ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে সই করে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। এই সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লাখ লাখ শরণার্থী ভারতবর্ষে আশ্রয় নিতে আসছিল। পন্ডিত নেহেরুর সরকার তাদেরকে জম্মু-কাশ্মীরে থাকার অনুমতি দেয়নি। শেষ ৭২ বছর পাকিস্তান বরাবর কাশ্মীরকে নিজেদের এজেন্ডা করে রেখেছে। সেই সময় পন্ডিতজি পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করেছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গণভোটের কথা বলেছিলেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়েছিলেন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে। তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জম্মু কাশ্মীরের তৎকালীন একচ্ছত্র অধিপতি শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাহর কথার উপর ভরসা করে। পরবর্তীতে পন্ডিতজি শেখ সাহেবের উপর ভরসা করা বন্ধ করেন এবং ১৯৫৩ সালে তাঁকে জেলবন্দি করেন। শেখ সাহেব এই রাজ্যকে নিজের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। সেই সময় জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে কংগ্রেস দলের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কংগ্রেস সদস্যরা ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্সের পূর্বতন সদস্য। রাজ্যে ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে আদতে একটা কংগ্রেস সরকার বসানো হল যার মাথায় ছিলেন বকশি গোলাম মহম্মদ। ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতারা তখন একটা গ্রুপ তৈরি করেছিলেন যার নাম 'প্লেবিসাইট ফ্রন্ট'। আসলে ন্যাশনাল কনফারেন্সের আড়ালে কংগ্রেস লুকিয়েছিল শুধুমাত্র ভোটে জেতার তাগিদে। ১৯৫৭, ১৯৬২ এবং ১৯৬৭

সালের নির্বাচনে অকল্পনীয়ভাবে রিগিং করা হল। আব্দুল খালিক নামের এক অফিসার, যিনি শ্রীনগর এবং দোদার কালেক্টর ছিলেন, তাকে এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার করা হয় এবং তিনি দায়িত্ব সহকারে উপত্যকায় সমস্ত বিরোধী দলের মনোনয়ন প্রত্যাখান করেন। নির্বাচনে প্রায় সমস্ত কংগ্রেসী প্রতিনিধি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল। সেদিন থেকেই কাশ্মীরের জনগণ কেন্দ্র সরকারের ওপর আস্থা হারাতে শুরু করে।

রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তারপর রাজ্যকে শেখ সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া আর তারও পরে রাজ্যে জোর করে এক কংগ্রেস সরকার বসিয়ে দেওয়া ছিল এক ঐতিহাসিক ভুল। শেষ সাত দশকের ইতিহাস বলছে এভাবে রাজ্য ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে এগিয়ে গেছে, ঐক্যের দিকে নয়। এগুলো এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্ম দিচ্ছিল। স্বভাবতই পাকিস্তান খুব খুশি ছিল এরকম পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারবে বলে।

এরপর ময়দানে এলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তিনি শেখ সাহেবকে মুক্ত করলেন এবং বাইরে থেকে কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে তাকে সরকার গড়তে সাহায্য করলেন। সেটা ছিল ১৯৭৫ সাল।কয়েক মাসের মধ্যে শেখ সাহেবের কথাবার্তা সম্পূর্ণ বদলে গেল এবং শ্রীমতি গান্ধী বুঝলেন তার পূর্বসূরি মতো তিনিও ভুল করে বসে আছেন।

শেখ সাহেবের পরে দল এবং রাজ্যের নেতৃত্ব মির্জা আফজল বেগের মত সিনিয়র ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতার হাতে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শেখ সাহেব কাশ্মীরকে নিজের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। শেখ সাহেবের উত্তরসূরি হিসেবে তাই মুখ্যমন্ত্রী হলেন ফারুক আব্দুল্লাহ। মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে কংগ্রেস রাজ্য সরকারকে ফেলে দিল। ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের কিছু প্রতিবাদি মুখকে সামনে এনে তৈরি করা হলো এক নতুন সরকার, যার মাথায় বসলেন গুল মহম্মদ শাহ। স্বভাবতই নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারলেন না। তিনি পরপর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনে বিবৃতি দিতে থাকলেন। ১৯৮৭ সালে রাজীব গান্ধী আবার কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন করলেন এবং ফারুক আব্দুল্লাহ ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাথে সম্মিলিত ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করলেন। এই নির্বাচনেও ভয়ংকরভাবে রিগিং হয়। যে সমস্ত প্রার্থীরা সেবার রিগিংয়ের জন্য হেরেছিলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তীতে তারাই হয়ে উঠেছিলেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা এবং সন্ত্রাসবাদী।

১৯৮৯-১৯৯০ সাল নাগাদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে গেল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার সাথে সাথে সন্ত্রাসবাদ বেড়ে উঠতে লাগল। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কাশ্মীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন শতকের পর শতক। তাদের উপর এমন অত্যাচার করা হল যে তাঁরা উপত্যকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

এদিকে যখন সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ তীব্র রূপ ধারণ করছে তখন কেন্দ্রীয় সরকার মোটামুটি ভাবে তিন রকমের চেষ্টা করেছিল। প্রথমত তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলোচনার চেষ্টা করল, যা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত তারা পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা

করল। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ভারত সরকার একটা সমস্যার সমাধানে সেই সমস্যার সৃষ্টিকারীদের সাথেই আলোচনা করছিল। আর যখন এই দুই ধরনের চেষ্টাই ব্যর্থ হলো তখন প্রধান দুই জাতীয় রাজনৈতিক দল কাশ্মীরের স্থানীয় দুই রাজনৈতিক দল অর্থাৎ পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাথে জোট করে তাদের ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করল। ভাবা হয়েছিল স্থানীয় রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকলে পরিস্থিতির ওপর সরকার এবং শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু দুক্ষেত্রেই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক দল দিল্লিতে এক ভাষায় কথা বলত আর শ্রীনগরে সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় কথা বলত। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তুষ্ট করার সবথেকে জঘন্যতম চেষ্টাটা অবশ্য করা হয়েছিল অনেক আগেই, ১৯৫৪ সালে, যখন প্রায় এক প্রকার জোর করে ধারা ৩৫এ কে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ধারা ভারতীয় নাগরিকদেরকে কাশ্মীরের মানুষদের থেকে পৃথক করার কাজ করছিল। এরই মধ্যে জামাতপক্ষ ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল উপত্যকাকে সুফিবাদ থেকে ওয়াহাবিবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

জম্মু-কাশ্মীর কে অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং অনুচ্ছেদ ৩৫এর আওতায় বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার ঐতিহাসিক ভুল দেশকে রাজনৈতিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজ যখন ইতিহাসকে আবার লেখা হচ্ছে তখন বোঝা যায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাশ্মীর নীতি ঠিক ছিল এবং পন্ডিতজির ভাবনা ছিল চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাশ্মীর পলিসি

শেষ সাত দশকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন চেষ্টা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাই এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিস্থিতির বিচার করলেন। কয়েকশো বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা এবং সন্ত্রাসবাদি রাজ্য ও দেশের ক্ষতি করতে চাইছিল। দেশের হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক এবং নিরাপত্তা রক্ষীর প্রাণ যাচ্ছিল। উন্নয়নে ব্যয় করার পরিবর্তে আমরা নিরাপত্তায় বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছিলাম। বর্তমান সিদ্ধান্ত এটা পরিষ্কার করে দেয় যে যদি ভারতের অন্য জায়গায় আইনের শাসন থাকে, তবে কাশ্মীর উপত্যকাতেও আইনের শাসন থাকতে পারে। আমরা তাই অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রচুর সংখ্যায় সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের মেরে ফেলা হয়েছিল। অনেকে বাধ্য হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দেওয়া নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল। আয়কর দপ্তর এবং এনআইএ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বেআইনি সম্পত্তি এবং আয়ের উৎসের দিকে নজর রাখছিল। যেখান যেখান থেকে সন্ত্রাসবাদীদের টাকা দেওয়া হয় সেখানে সেখানে চাবি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসবের মাঝখানে শেষ দশ মাসে শুধু কয়েকশো স্বার্থবাদী মানুষের অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের বাকি জনগণ কয়েক দশক পরে শান্তির আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে। তারা সন্ত্রাসবাদের শিকার ছিল এবং যেহেতু উপত্যকায় মূলত মুসলিমদের বসবাস ছিল সেজন্য যা ক্ষতি হওয়ার তাদেরই হত। অনেকে তাই ভয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছিল।

পিডিপি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতারা প্রায়ই বলে থাকে যদি আর্টিকেল ৩৭০

এবং আর্টিকেল ৩৫এ লঘু করা হয় তবে কাশ্মীর ভারতের থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারে কারণ এটি দেশ এবং কাশ্মীরের মধ্যে একমাত্র যোগসুত্র। এটা একদম ভুল কথা। ভারতভুক্তির চুক্তিপত্র সই হয়েছিল ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। তখন আর্টিকেল ৩৭০ আর্টিকেল ৩৫এ কোন কিছুই ছিল ছিল না। ৩৭০ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৫০ সালে আর সেটাও দশ মিনিটের কম সময় আলোচনার পর। সরকার এবং অন্যান্য পক্ষের নেতারা তখন সংবিধান সভায় অনুপস্থিত ছিল। কেউ কেউ ইচ্ছা করেই এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি ঠিক এই সময় এন গোপালস্বামী আয়নগর এই ধারা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার বলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটি একটি অস্থায়ী ধারা। আশ্চর্যজনকভাবে শুধুমাত্র একজন সদস্যকে এর ব্যাপারে বলতে দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেই সদস্য স্বভাবতই ধারা ৩৭০ এর বিরোধিতা করেননি। তবে তিনি এ দাবি করেছিলেন যে তিনি যে অঞ্চল থেকে আসেন সেখানেও এই ধারা লাগু করা হোক। আজ গোটা ভারত একটাই জাতি এবং সমস্ত নাগরিক সমঅধিকারসম্পন্ন। শুরুতে তো পন্ডিতজি সুপ্রিম কোর্ট বা নির্বাচন কমিশনকে জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকতে দেননি। পরে অবশ্য তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি জাতির মধ্যে একটি উপজাতি তৈরি করছেন। শেখ সাহেবকে যখন পদ থেকে সরানো হয় এবং জেলবন্দি করা হয় শুধুমাত্র তারপরেই জম্মু-কাশ্মীরে কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ঢুকতে পেরেছিল।

এরকম সিদ্ধান্তকে বদলে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল একটি স্বচ্ছ এবং কঠিন মানসিকতা। এর জন্য প্রবল রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিরও দরকার ছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস তৈরি করেছেন তাঁর বজ্রকঠিন মানসিকতা এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি দিয়ে।

কাশ্মীরের নাগরিকদের উপর ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ র কুপ্রভাব

আজ ভারতের যে কোনো নাগরিক কাশ্মীরে যেতে পারে, সেখানে থাকতে পারে, সেখানে বিনিয়োগ করতে পারে, এমনকি সেখানকার উন্নতিতে অবদানও রাখতে পারে। আজ কাশ্মীরে শিল্প নেই। খুব বেশি হলে কিছু বেসরকারি হাসপাতাল আছে মাত্র। কোন ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ভারতের সবচেয়ে সুন্দর রাজ্যে কোন বড় হোটেল কোম্পানির কোন বিনিয়োগ নেই। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় যুবকদের জন্য কাজের অবসরও খুব কম। পাশাপাশি রাজ্যের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহও কঠিন হচ্ছিল। এর ফলে ওই রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এক প্রকার অনিশ্চয়তা কাজ করছিল। এই দুই ধারা সংশোধনযোগ্য নয় এরকম কোন ব্যাপার ছিল না। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এদের সংশোধন করাই যেত। প্রধানমন্ত্রী শুধু তাই করেছেন। তাছাড়া বর্তমান সরকার আইন এবং সংবিধানের সাহায্য নিয়ে সংশোধনীগুলো পেশ করেছে। কিন্তু যখন এগুলিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন পিছনের দরজা দিয়ে করা হয়েছিল। সেটা কোনদিনই ন্যায় সংগত নয়।

দুই স্থানীয় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

জম্মু-কাশ্মীরের দুই স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতারা বরাবরই ভিন্ন ভাষায় কথা

বলতে অভ্যস্ত। তাদের দিল্লির নেতারা যে ভাষায় কথা বলেন শ্রীনগরের নেতারা তার ঠিক উল্টো ভাষায় কথা বলেন। তাদের এই অবস্থান বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিবেশের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। বাস্তব কথা হল এই দুটো দলই তৃণমূল স্তরে তাদের সমর্থন হারিয়েছে। একাধিক জাতীয় রাজনৈতিক দল তাদের ভুল পথে চালনা করেছিল। জাতীয় ঐক্যের কথা বললেই তারা বরাবর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন টানে। কিন্তু তারা কোনদিনই ধর্মনিরপেক্ষ দল নয়। নিজেদের ব্যক্তিগত এবং স্থানীয় স্বার্থের ঊর্ধে উঠে জাতীয় স্বার্থের কথা তারা কোনদিনই বলতে পারে নি।

কাশ্মীর ইস্যুতে ব্যাপক জনসমর্থন দেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়। তারা বুঝতে পেরেছিল একেবারে নিচুতলার মানুষেরা কি চায়। তবে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধে উঠে সেই চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। আজ তারা বাধ্য হয়েছে টিকে থাকার তাগিদে। কংগ্রেস প্রথম এই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে এই সমস্যার বৃদ্ধিতেও তারাই সাহায্য করে। কিন্তু তারা সমস্যার কারণ বুঝতে পারেনি। যেমন রাহুল গান্ধী জহরলাল নেহেরু বিদ্যালয়ে গিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী পড়ুয়াদের একটা অংশকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল। কংগ্রেস সমর্থকরা সেটাকে ভাল চোখে দেখেনি। যদিও কংগ্রেসের উচ্চস্তরের নেতাদের কান অব্দি এই বার্তা পৌঁছাতে পারেনি। ফল চোখের সামনে। ঘটনাচক্রে আজ কংগ্রেসেরও অনেক সদস্য এই বিলের সমর্থনে। মানুষের রায় আজ এই বিলের পক্ষে। তবু ওই জাতীয় দল নিজেদের অন্ধবিশ্বাস কে ত্যাগ করতে পারছে না। নতুন ভারত বদলে গেছে। শুধু কংগ্রেসই সেটা বুঝতে পারছে না। কংগ্রেসের নেতারা নিজেদের ভাঙ্গা তরীকে আরো ভেঙে ডুবিয়ে দেওয়ার রাস্তায়।

৫.২ ধারা ৩৭০: শঙ্কামুক্তি

২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর জম্মু-কাশ্মীর কে প্রায় ৪৮,৯১০ কোটি টাকা করে সহায়তা কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর খুব কম টাকাই রাজ্যের উন্নয়নে কাজে লেগেছে। দুর্নীতির জন্য জম্মু-কাশ্মীরে ভালো রাস্তা, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সুবিধা কিছুই মেলেনি।

জম্মু-কাশ্মীরে পঞ্চায়েত ঠিকভাবে কাজ করে না। গণতন্ত্র এখানে গ্রামেগঞ্জে পৌঁছায় না। ফলে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের বরাবর ভুগতে হয়। জম্মু-কাশ্মীরে পঞ্চায়েতিরাজ নিয়ম ১৯৮৯ চালু হবার পর প্রায় বার বছর পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোট হয়নি।

শেষ অনেক বছর জম্মু-কাশ্মীর সরকার কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের কোন হিসাব দেয়নি। ব্যাংক দুর্নীতি, নিয়োগ দুর্নীতি, সরকারি চাকরিতে অনিয়ম, লাইসেন্স দুর্নীতির মত বিভিন্ন বিষয় সরকারের অন্দরে ছেয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে বিশেষ ধারণা নেই।

ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা সংবিধানে পঞ্চম তপশিল যোগ করেছিলেন উপজাতি সংস্কৃতি, উপজাতি অধিকার এবং উপজাতিদের এলাকা রক্ষা করার জন্য। যেহেতু এই তপশিলের দশমাংশ জম্মু-কাশ্মীরে প্রয়োগ করা যায়নি তাই ওই রাজ্যের তপশিলি উপজাতিরা

নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তারা বিভিন্ন সরকারি সুবিধা মূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এমনকি পঞ্চম তপশিলের ন্যায্য সুযোগ গুলিও তারা পায়নি।

ধারা ৩৫এর সৌজন্যে বাইরের রাজ্যের লোকেরা এখানে চাকরি করতে পারে না। পেশাদার যুবকেরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াতে পারে না। পেশাদার ভালো চিকিৎসকরা মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে পারে না, বা সেখানে উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে না। ভাল চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার এর অভাবে সেখানের স্বাস্থ্য এবং পরিকাঠামো দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা সারাদেশে তাদের অফিস খুলছে। কিন্তু ধারা ৩৫এর জন্য কোন বহুজাতিক সংস্থা জম্মু-কাশ্মীরে আসতে পারেনি। এর ফলে শিক্ষিত যুবকরা চাকরি এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্যাংক যেহেতু এখানে বড় লোন দিতে পারে না সেজন্য স্থানীয় মানুষের। বড় ব্যবসা বা প্রকল্প শুরু করার মূলধন জোগাড় করতে পারে না।

৫.৩ একতার পথে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ

কেউ কেউ বলে জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে দেরি হওয়ার জন্য বিভিন্ন সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। তাদের জানা উচিত কিছু কিছু রাজ্য, যেমন ত্রিপুরা (১৯৪৯), জম্মু-কাশ্মীরের অনেক পরে ভারতে যোগ দিয়েছিল। ভারতে যোগ দেওয়া শেষ রাজ্য কোনদিনই জম্মু-কাশ্মীর ছিল না। কিন্তু অন্যদের সমস্যা না হলে জম্মু-কাশ্মীরের হবে কেন!

জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভা খুব অসাংবিধানিক উপায়ে গঠন করা হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনগুলিও নিয়ম মেনে হত না। কেন্দ্র সব জানত। কিন্তু কোনো পদক্ষেপ করত না। সব থেকে বড় কথা রিগিং করে জিতে আসা প্রতিটি বিধানসভা সদস্য কে কেন্দ্র মান্যতা দিয়েছিল।

১৯৫১ সালে জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা তৈরি হয়। কিন্তু বাস্তবে তখন কোনো নির্বাচন হয়নি। সহজ করে বলতে গেলে প্রতিটি বিধায়ক তখন শেখ আব্দুল্লাহ ন্যাশনাল কনফারেন্স কর্তৃক মনোনীত হত। বিরোধীদের সমস্ত নমিনেশন বাতিল করা হয়েছিল। ৭৫ টা বিধানসভা আসনের মধ্যে ৭৩ আসনে ন্যাশনাল কনফারেন্স সদস্যরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছিল। বাকি দুটোতে তাদের সদস্যরাই জিতেছিল। অর্থাৎ সোজা কথায় ৭৫ আসনের বিধানসভায় সব সদস্য ছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের। গণতন্ত্রের জন্য এর থেকে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে!

এইসময় নেহেরু একপ্রকার শেখ আব্দুল্লাহর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তিনি বাধ্য হয়ে আব্দুল্লাহ সমস্ত অন্যায্য দাবি এবং প্রস্তাব কে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। তিনি গোটা বিশ্বকে দেখাতে গিয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে আছে। আর যারা বলছে ধারা ৩৭০এর বিলুপ্তি অসাংবিধানিক উপায়ে করা হয়েছে তাদের জানা উচিত এই ধারা সংবিধানে যোগ করা হয়েছিল অন্যায়ভাবে। সংবিধানকে একপ্রকার দূরে সরিয়ে রেখে তৈরি হয়েছিল অনুচ্ছেদ ৩৭০।

১৯৫৪ সালের সরকারি আদেশনামা চূড়ান্তভাবে অসাংবিধানিক ছিল। এই আদেশ সংবিধানের মূল ভাবনা কে কে আঘাত করে। এটা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এমনকি শপথ বাক্য পাঠের বক্তব্যেও পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এটা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকেও কমিয়ে দিয়েছিল। ভারতের জনতা কে এই আদেশ দুটো সমান্তরাল স্তরে ভেঙে দেয়। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা শুরুতেই বলে "আমরা ভারতের জনগণ"। সেই জনগণকে দু"ভাগে ভেঙে দিয়েছিল এই আদেশনামা।

জনগণের মৌলিক অধিকারকে হরণ করেছিল এই ধারা। এই আইনে রাজ্যের মেয়েরা যেখানে খুশি বিয়ে পর্যন্ত করতে পারত না। যদি রাজ্যের বাইরে বিয়ে করত তবে ওরা সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো।

যেভাবে ১৯৫৪ সালের আদেশ এসেছিল ঠিক ঠিক সেভাবেই ২০১৯ সালের আদেশনামাও সামনে আসে। পার্থক্য এটাই আগের আদেশ ভারতীয় সংবিধানের প্রগতিতে বাধা ছিল ছিল আর এবারের আদেশ রাজ্যকে ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

৫.৪ মুক্তি: ধারা ৩৭০ এবং ৩৫এ জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকের উপর চাপানো বোঝা ছিল, আর কিছু নয়

জম্মু-কাশ্মীরের ব্যাপারে "বিশেষ" শব্দটার সবথেকে বেশি অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। এই একটা শব্দের ফলে বছরের পর বছর নাগরিক অধিকার হরণ, মানুষের স্বাভাবিক সম্পদের শোষণ এবং চরমতম দুর্নীতির শিকার হয়েছে জম্মু কাশ্মীর রাজ্য।

বিশেষ অধিকারের ভ্রান্ত ধারণা

অনুচ্ছেদ ৩৭০ এর ক্ষমতাবলে ক্ষমতাসীন ধারা ৩৫এ রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দেয় কে সেখানকার বাসিন্দা আর কে নয় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। যারা রাজ্য কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা মান পূরণ করতে পারে তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যাদের হাতে স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট থাকে তারাই শুধু কিছু বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। কি এই বিশেষ সুবিধা! একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক। এগুলো আসলে আর কিছুই না; এগুলো সেরকমই কিছু সুবিধা যেগুলো অন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ ভারতীয় সংবিধানের বলেই পেয়ে থাকে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি কেনার অধিকার।
যোগ্যতা নির্ভর স্কলারশিপে আবেদনের অধিকার।
উচ্চতর প্রযুক্তি শিক্ষার অধিকার।
সরকারি চাকরিতে আবেদনের অধিকার।
বিধানসভা এবং স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার।
সরকারি প্রকল্পের সুবিধার অধিকার।
নিজের পছন্দের নাগরিককে বিয়ে করার অধিকার (শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য)।

যেহেতু ভারতীয় সংবিধানের একাধিক আইন জম্মু-কাশ্মীরে লাগু হত না, তাই ওখানকার লোক ধর্ষণ বিরোধী আইন, দুর্নীতি বিরোধী আইন, রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘু আয়োগের আইনের মত একাধিক কেন্দ্রীয় আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। হিসাব বলছে প্রায় একশোর উপর অতি প্রয়োজনীয় ভারতীয় আইন জম্মু-কাশ্মীরে প্রয়োগ করা যায়নি।

এবার দেখা যাক এই আইন কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে গেছে দিনের পর দিন

পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়

জম্মু-কাশ্মীরের পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট হাতে রাখলেও সংরক্ষণের বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত। শিক্ষাক্ষেত্রে বা আইনসভায় তাদের জন্য কোন সংরক্ষণ ছিল না।

জম্মু-কাশ্মীরে তপশিলি উপজাতিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ। কিন্তু তারা রাজ্য বিধানসভায় কোন সংরক্ষণ পায় না।

২০০২ সালে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় আসনভিত্তিক ডিলিমিটেশন হয় যা ২০৩১ সাল পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এই ডিলিমিটেশনে বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া এলাকা যথেষ্ট বঞ্চিত হয়েছে। বিধানসভায় তাদের যথোপযোগ্য প্রতিনিধি নেই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ পর্যন্ত কেউ এই ব্যাপারে কোর্টের দ্বারস্থ হয়নি।

মহিলারা দীর্ঘদিনের আইনি বঞ্চনার শিকার

স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট (পিআরসি) সংক্রান্ত আইন মহিলাদের জীবনসঙ্গী পছন্দ করার ব্যাপারে সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে। একজন পিআরসি হোল্ডার মহিলা যদি একজন নন-পিআরসি হোল্ডার পুরুষকে বিয়ে করে তবে তার পরিবার উপরোক্ত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হত। অর্থাৎ তারা আসলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে রাজ্যে বাস করতে বাধ্য হত বা জম্মু-কাশ্মীর ছেড়ে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হত। মজার কথা হল পুরুষদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই আইন প্রযোজ্য হত না। সে ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী এবং শিশুরা নিজে নিজেই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেত।

বাস্তুচ্যুত পরিবার

২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে প্রায় সাড়ে চার হাজার পরিবারকে স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করে। এদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার সময় পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। ঘটনাচক্রে এই পরিবারগুলো মহারাজা হরি সিংয়ের শাসনকালে জম্মু-কাশ্মীরের সরকারি বাসিন্দা ছিল এবং পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে তারা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে পালিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী

উন্নয়ন প্রকল্পে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা বাসিন্দাদের বিভিন্ন রাজ্যে নানারকম সহায়তা করা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জম্মু-কাশ্মীর সরকার এদেরকে সেটুকু সাহায্যও করেনি।

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো রাজ্যের আইন অনুযায়ী যারা দেশভাগের সময় পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে জম্মু-কাশ্মীরে এসে তাদের জমি এবং অন্যান্য অধিকার দাবি করে, রাজ্য তাদের সে দাবি পূর্ণ করতে বাধ্য।

নন-পিআরসিরা মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত

স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট নেই এমন লাখ লাখ লোক শেষ সাত দশক ধরে জম্মু-কাশ্মীরে চরমতম অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন। তাঁরা লোকসভা ভোট দিতে পারে কিন্তু বিধানসভা বা স্থানীয় নির্বাচনে তাদের কোন ভোটদানের অধিকার নেই।

সেই সমস্ত সম্প্রদায় যারা অনুচ্ছেদ ৩৫এ এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে আইনি পশ্চাৎবর্তীতার শিকার হয়েছেন

বাল্মীকি (সাফাই কর্মচারী)

১৯৫৭ সালে জম্মু-কাশ্মীর সরকার পাঞ্জাব থেকে প্রায় ২০০ বাল্মিকী পরিবারকে সাফাই কর্মচারীর কাজ করতে রাজ্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায়। তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তাদের স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। কিন্তু সম্ভবত তারা বুঝতেও পারেনি যে তারা চিরকাল শুধু সাফাই কর্মচারী হয়েই থেকে যাবেন। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সমস্ত আশাভরসা শেষ হয়ে যাবে আর পাঁচজনের মত সাধারণ স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট না পেয়ে।

ছয় দশক পর আজ তারা সংখ্যায় বেড়েছে। মা বাবারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায়। ভাবে ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে ভালো কিছু করবে। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য যে তারা শুধুমাত্র সাফাই কর্মচারী হিসাবেই রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের অন্য কোনো কাজ করার অধিকার নেই।

বাল্মিকী সন্তানরা সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুবিধা পায় না। বাল্মিকী পরিবারের শিক্ষিত যুবকরা শুধুমাত্র সুইপার পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারে। এমনকি তাদের প্রমোশনও হয় না।

পশ্চিম পাকিস্তানের শরণার্থী

দেশভাগের সময় যে হাজার হাজার ভারতীয়রা পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে সীমানা পেরিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে এসেছিলেন তাদেরকে আজও "পশ্চিম পাকিস্তান শরনার্থী" বলা হয়। আজকের দিনে, এই ২০১৯ সালে, যদি কোন সন্তান জন্ম নেয় তাদের পরিবারে, তবে সেও বড় হবে "পশ্চিম পাকিস্তান শরণার্থী" হিসেবেই।

আর পাঁচজন সাধারণ হিন্দুর মতো তারাও ভারতে থাকতে এসেছিলেন। কিন্তু

তাদের দুর্ভাগ্য তারা জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিলেন। ফলস্বরূপ আজ প্রায় সাত দশক পরেও তারা শরনার্থী হিসেবেই চিহ্নিত হন এবং শরণার্থী শিবিরে থাকতে বাধ্য হন। এমনকি তাদের তৃতীয় প্রজন্মের সন্তানরাও শরণার্থী হিসেবে চিহ্নিত হন এবং সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে স্বাভাবিকভাবে বঞ্চিত হন।

দেশভাগের সময় যারা পাকিস্তান থেকে ভারতের অন্যান্য অংশ যেমন দিল্লি, মুম্বাই বা সুরাটে এসেছিলেন তারা বিভিন্ন রকমের সরকারি সুযোগ সুবিধা যেমন ঘর, চাকরি ইত্যাদি পেয়ে ধীরে ধীরে সমাজের মূল স্রোতে মিশে গেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দেশের শীর্ষস্থানীয় পদগুলি দখল করতেও পেরেছেন ভারতীয় সংবিধানের জোরে। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে আসা শরণার্থীরা নূন্যতম সুবিধাটুকুও পায় না। প্রায় সত্তর বছর পর আজও তারা বাধ্য শ্রমিক। তাদের পরিবার ''শরণার্থী'' ট্যাগ ঘুচিয়ে ফেলে এক সম্মানের জীবন পালন করতে চায়।

গোর্খা সম্প্রদায়

গোর্খারা জম্মু-কাশ্মীরে এসেছিলেন অষ্টাদশ শতকে। প্রায় এক লক্ষ গোর্খা আজ কাশ্মীর উপত্যকা সমেত গোটা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করেন। ভারতের একতা এবং জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে বহুবার গোর্খারা নিজেদের চরমতম আত্মবলিদানের পরিচয় দিয়েছে। যাই হোক এখন তাদের পক্ষে স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট জোগাড় করাও কঠিন। যার ফলে শিক্ষিত গোর্খা যুবক-যুবতীরা সরকারি চাকরিও পায় না আর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতেও পারে না।

বলিদান দেওয়া সৈন্যদের পরিবার ও সম্প্রদায়

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যরা অনেকেই পাকিস্তান এবং চীনের সাথে ভারতের সীমানা রক্ষা করতে গিয়ে এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিভিন্ন অপারেশনে গিয়ে নিজেদের প্রাণের বলিদান দিয়েছেন। এরকমই ২১ জন সৈনিককে যারা শত্রুর সাথে সীমানা রক্ষার লড়াইয়ে নিজেদের চরমতম আত্মবলিদান দিয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ সৈনিক সম্মান পরম বীর চক্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই একুশ জনের চোদ্দ জনই আলাদা রাজ্যের বাসিন্দা। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা এবং এর সম্পত্তি ও জমি রক্ষা করতে গিয়ে যারা নিজেদের জীবন এবং পরিবারকে চরমতম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন বারবার, তাঁদের সম্মান স্বরূপ এক খন্ড জমিও দেওয়া যায়নি জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ আইনের সৌজন্যে। অথচ তাঁদের অনেকের পরিবারই জম্মু-কাশ্মীরে থেকে যেতে চেয়েছিলেন।

সরকারি কর্মচারী সম্প্রদায়

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করা এমন অনেক সিভিল সার্ভেন্ট আছেন যারা প্রায় ৩০ থেকে ৩২ বছর জম্মু-কাশ্মীরে কাজ করেছেন। অবসরের পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সেখান থেকে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের আইন তাদেরকে সেখানে থাকতে

দেয়নি। সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের জন্য দরজা চিরকালই বন্ধ ছিল।

৫.৫ লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার মর্মার্থ

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো জম্মু-কাশ্মীর থেকে লাদাখ কে আলাদা করা এবং একে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া। সংসদ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরপরই লাদাখ অঞ্চলে উৎসব শুরু হয়ে যায়। এর থেকেই বোঝা যায় ওই অঞ্চলের মানুষেরা এই সিদ্ধান্তকে কতটা গুরুত্ব সহকারে বিচার করছিলেন। আসলে দশকের পর দশক ধরে লাদাখ রাজ্য সরকার কর্তৃক অন্যায় এবং বঞ্চনার শিকার।

চেওয়ান রিংচেনের নেতৃত্বে লাদাখের সাহসী যুবকেরা ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি সেনার বেশে হওয়া উপজাতি আক্রমনকে বীরদর্পে আটকে দিয়েছিলেন। তাদের এই প্রতিরোধের ফলে ভারতীয় সৈন্যরা লাদাখ পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট সময় পেয়ে যায়। এবং তারপর ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তান আর্মি কে পিছু হটতে বাধ্য করে। সোনাম নোরবুর নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষেরা লেহতে খুব দ্রুত একটি আপৎকালীন বায়ু ঘাঁটি তৈরিতে ভারতীয় বায়ুসেনাকে সাহায্য করেছিলেন। মূলত এই বায়ুঘাঁটির সৌজন্যে ভারতীয় বায়ুসেনা জাস্কার থেকে অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানি সেনাকে পিছু হটতে বাধ্য করে লেহ-শ্রীনগর রাস্তার থেকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয় যা ওই যুদ্ধে ভারতের জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত করেছিল।

শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ এবং ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। এছাড়া লাদাখের লোকেরা সিয়াচেন হিমবাহের উপর ভারতীয় সৈন্যের অধিকার বজায় রাখতে বরাবরই ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম এই যুদ্ধক্ষেত্র পাকিস্তান বারবার দখল করতে চেয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের সহায়তায় ভারতীয় সেনা তা হতে দেয়নি।

লাদাখের বাসিন্দারা কখনই শ্রীনগর থেকে চলা সরকারের থেকে যথাযোগ্য সুবিধা পায়নি। রাজ্যের মোট ভৌগলিক ভূখণ্ডের তাই ষাট শতাংশ অঞ্চলজুড়ে লাদাখ। কিন্তু ভৌগলিক দূরত্ব এবং কম জনসংখ্যার কারণে শ্রীনগর থেকে চলা সরকার তাদের বরাবর অগ্রাহ্য করেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ লাদাখ বরাবরই প্রভূত উন্নয়নের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু পর্যটন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এর যথাযোগ্য উন্নয়নে রাজ্য সরকার কখনই গুরুত্ব দেয়নি। রাজ্য সরকার চেয়েছিল এর বিশেষ ভাষা সংস্কৃতিগত পরিচয়কে মুছে ফেলতে। কিন্তু প্রবল জনআন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয় স্বয়ংশাসিত হিল কাউন্সিল তৈরি করতে।

ভারতের স্বাধীনতা এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের অনুপ্রবেশের পর ১৯৪৯ সালে চীন নেব্রা উপত্যকার সঙ্গে জিনজিয়াং প্রদেশের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে লাদাখের মানুষের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে পড়ে। চীন এরপর তিব্বত অধিকার করলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। ফলে লাদাখের লোকজন, যারা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা

নির্বাহ করতো, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সবথেকে বেশি ব্যবসা করা অঞ্চল একসময় অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে প্রায় আলাদা হয়ে যায়।

১৯৯৫ সালে লাদাখ অটোনমাস হিল কাউন্সিল তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত লাদাখের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ১৯৭৪ সালের পর থেকে পর্যটনের কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বের সামনে আসার সাথে সাথে লাদাখের উন্নতির প্রভূত সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বাস্তবের মুখ দেখে হিল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পরই। তার আগে পর্যন্ত লাদাখকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না। নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় লাদাখে এবার নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা হবে। অনেক নতুন নতুন অফিস হবে। ফলে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক বিনিয়োগের আশা দেখা যাচ্ছে।

এর ফলে নতুন নতুন সরকারি চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ এবং বিনিয়োগ এই অংশে আসতে শুরু করবে। যে অর্থ আগে শুধু শ্রীনগরে যেত তা এখন লাদাখেও আসবে। পর্যটন ক্ষেত্র এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।

নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের বিশেষ ভাষা-সংস্কৃতিগত এবং ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ থাকবে।

ধারা ৩৭০/৩৫এ: পাকিস্তান কেন এর অন্তর্জাতিকরণে ব্যর্থ

ভারত ৩৭০ ধারা মুছে দেওয়ার পর যে সমস্ত পদক্ষেপ পাকিস্তান গ্রহণ করেছে তা তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করবে। ভারত থেকে আমদানি বন্ধ করায় পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে। ভারতের অর্থনীতির উপর এর বিশেষ প্রভাব না পড়লেও পাকিস্তানের অর্থনীতি এতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরবর্তী এক বা দুই দশকে বৃহৎ আন্তর্জাতিক শক্তির দ্বিমেরুকরণে ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। আমেরিকা বা চীন কেউই এখন ভারতকে রাগাতে চায় না। আমেরিকা ভারতের সঙ্গে স্থিতাবস্থা বজায় রেখে ক্ষমতার আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে চায় আর চীন প্রতিবেশী হিসেবে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে সঙ্গে নিয়ে ভারসাম্যের পথে চলতে চায়।

পাকিস্তান বিশ্বাস করত চীন তাদের চিরকালীন মিত্র। এইজন্য ভারত ধারা ৩৭০ মুছে ফেলার সাথে সাথে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি চীনে ছুটেছিলেন। পাকিস্তান চেয়েছিল চীন ভারতকে একটা শক্তিশালী ডিপ্লোম্যাটিক বার্তা দিক যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতকে কোণঠাসা করতে পারবে। কিন্তু চীন এরকম কিছু করেনি।

আমেরিকার রাজ্য দপ্তরের মুখপাত্র মর্গ্যান অর্থেগ্যাস বলেছেন ৩৭০ ধারার বিলুপ্তি ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তান রাশিয়া থেকেও কোন সাহায্য বা সহমর্মিতা পায়নি। রাশিয়া স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি এবং পরিবর্তন ভারতীয় গণতন্ত্রের সংবিধানের কাঠামোতে সাযুজ্যপূর্ণ। আগস্টের ২৮ তারিখে ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত দিল্লিতে বলেন, "৩৭০ ধারার বিলুপ্তি ভারত সরকারের এক সার্বভৌম সিদ্ধান্ত এবং এটা তাদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার।"

পাকিস্তান বরাবরই নিজেদেরকে মুসলিম ব্রাদারহুড দেশগুলির নেতা হিসেবে দেখে। কিন্তু একটি মুসলিম দেশও পাকিস্তানের পক্ষে বিবৃতি দেয়নি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী খোলাখুলি ভাবে বলেছে জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত পরিবর্তন ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাষ্ট্রদূত আগস্টের ৬ তারিখ ভারতে বলেন, "রাজ্যগুলির পুনর্গঠন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কোন নতুন ব্যাপার নয়। এটা মূলত আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে এবং গণতান্ত্রিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের এটা একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার।"

ধারা ৩৭০ অবলুপ্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে সৌদি আরবের বৃহত্তম সরকারি তেল কোম্পানি আরামকো প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা ভারতীয় তেল কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঘটনাচক্রে পবিত্র মক্কা-মদীনার দেশ সৌদি আরব আবার সুন্নি বিশ্বের নেতা।

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা, মলদ্বীপ, বাংলাদেশ খোলাখুলিভাবে ভারত সরকারের ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পক্ষে মত দিয়েছে।

পরমাণু শক্তিধর দেশ হওয়ার পর পাকিস্তান গর্ব করে বলতো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র তারাই পরমাণু শক্তিধর। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রমহ্রাসমান আন্তর্জাতিক সম্মান তাদেরকে দিনে দিনে একঘরে করে তুলেছে।

৫.৬ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং আর্টিকেল ৩৭০

জনসংঘ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ২১ অক্টোবর ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যান্য ইস্যুর সাথে সাথে জনসংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল মৌলিক অধিকার রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়বিচারের প্রতিপালন, জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ সংযোজন সহ একটি সংঘবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে।

একটি তিন দিনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ১৯৫২ সালের ১০-১২ ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দীনদয়াল উপাধ্যায়ও সভায় অংশ নিয়েছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল অন্যান্য প্রস্তাবগুলির সাথে। প্রস্তাব অনুযায়ী অন্য রাজ্যের মত জম্মু ও কাশ্মীরও একই ভাবে ভারতের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত।

জনসংঘের দ্বিতীয় জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪-১৫ জুন দিল্লিতে। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ১৯৫২ সালের ২৯ শে জুন জম্মু ও কাশ্মীর দিবস দেশব্যাপী উদযাপিত হবে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় কানপুরে এক জনসভায় বলেছিলেন যে, কাশ্মীর কোন দল, শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়। এটি সমগ্র জাতির একটি সার্বজনীন ইস্যু।

১৯৫২ সালের ২৪ জুলাই নেহেরু-শেখের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, যা দিল্লি চুক্তি বা জুলাই চুক্তি নামে পরিচিত। জুলাইয়ের এই চুক্তিকে দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি সাঙ্ঘাতিক

ভুল হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন যেহুতু এটা কাশ্মীরকে নানাভাবে বিশেষ অঞ্চলের মর্যাদা দিয়েছে।

চার দিন পর দীনদয়াল উপাধ্যায় মীরঠে একটি জনসভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় তিনি জুলাই চুক্তির সমালোচনা করে বলেছিলেন পৃথক পতাকা এবং মৌলিক অধিকার সম্বন্ধিত ধারাগুলি ঐতিহাসিক কারণের জন্য নয় কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক কারণের জন্য স্থান পেয়েছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় বলেছিলেন লৌহমানব সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে নেহেরুদের তুষ্টিকরণের নীতি এবং কাশ্মীর ইস্যু রাষ্ট্রপুঞ্জের সামনে তুলে ধরা কোনো ভাবেই দেশের স্বার্থের পক্ষে নয়। শেখ আব্দুল্লাহ তার নিজের হাজারো উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে নিজের সাম্রাজ্য তৈরি করতে চাইছেন। সত্যি এখন সবার সামনে। এবার ভারতীয় জনসাধারণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা এটার বিরোধিতা করবে না চোখ বন্ধ করে সব মেনে নেবে।

জনসংঘ ১৯৫৯ সালে দেশের ঐক্যবদ্ধ সীমাবদ্ধকরণে একটি বড় সাফল্য দেখেছিল। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন তখনও জারি ছিল। পারমিট সিস্টেম অনুযায়ী কাউকে ওই রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নিতে হত এবং রাজ্যে ছিল সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারের বাইরে। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জনসংঘের বেঙ্গালুরু অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, জনগণকে জারি হওয়া বিধিনিষেধ সম্বন্ধে সচেতন করতে একটি বিশাল আন্দোলন শুরু করা হবে।

সারা দেশব্যাপী ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ এ কাশ্মীর দিবস পালন করা হবে। জনসঙ্ঘের এই দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলস্বরূপ, ১৯৫৯ সালের ১ এপ্রিল পারমিট সিস্টেমটি বাতিল করা হয়েছিল। ১ এপ্রিল, ১৯৫৯ সালে, রাজ্য আইনসভা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু আর্টিকেল ৩৭০ এর জন্য সেখানে এই বিধানগুলি প্রয়োগ করা যায়নি।

জনসঙ্ঘের মনোবল কখনই কমে যায়নি। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রতিটি অধিবেশন, জাতীয় সংসদের সভা এবং জাতীয় অধিবেশনগুলিতে ৩৭০ আর্টিকেল অপসারণের বিষয়ে প্রস্তাবগুলি পাস করা হয়েছিল। ১৫ জানুয়ারী ১৯৬৬ জনসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা কানপুরে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাশ্মীরের ভারতের সাথে সাংবিধানিক সংযোজন সম্পূর্ণ বিষয়টিই ভারতের অভ্যন্তরীন ব্যপার। রাজ্যের সামগ্রিক ভারতভুক্তি জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সাথে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রথমিক পূর্বশর্ত।

১৯৮০ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ডঃ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠিত হয়েছিল। তার অধ্যবসায় ৩৭০ ধারা বাতিল করার দাবিতে অব্যাহত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত ২০১৯ সালে তা সাফল্য অর্জন করল।

পর্ব - ৬

তথ্যসূত্র

দীনদয়াল উপাধ্যায়, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা ৬৬-৮১

দীনদয়াল উপাধ্যায়, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৪

Atal Bihari Vajpayee: Four Decades in Parliament, Vol. - 1, Page - 410-419

লোকসভার কার্যবিবরণী (খন্ড - ৩৫)

সংবিধান সংশোধনী বিল, লোকসভা (সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ডিসেম্বর) (১৯৬৪)

সংবিধান সভার কার্যবিবরণী (খন্ড - ১০)

ভারতীয় জনসঙ্ঘ, নীতি ও ইস্তেহার, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা নং ২৬৩-২৭৬

দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ধারা ৩৭০ - দেবেশ খানদেলওয়াল

নির্বাচনী ইস্তেহার, পার্টি ডকুমেন্ট (খন্ড - ১) পৃষ্ঠা ৩৬১

নির্বাচনী ইস্তেহার — ২০১৪

নির্বাচনী ইস্তেহার — ২০১৯

অনুচ্ছেদ ৩৭০: সন্দেহের অবসান

জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ: সংযুক্তিকরণের যাত্রা - অরুণ কুমার

মুক্তি: ধারা ৩৭০, ৩৫এ জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্য মনস্তাত্ত্বিক বাধা ছিল আর কিছুই নয় - আভা খান্না

লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার প্রভাব - অলোক বানসাল

ধারা ৩৭০/৩৫এ: পাকিস্তান কেন আন্তর্জাতিকীকরণে ব্যর্থ হয়েছিল - উমেশ উপাধ্যায়

দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং অনুচ্ছেদ ৩৭০ - দেবেশ খানদেলওয়াল

Implication of Ladhak as UT - Alok Bansal

নেহেরু ৩৭০ ধারাটিকে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন

নেহেরুও ধারা ৩৭০ কে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৪ শে জুলাই সংসদে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "আমরা বিভিন্ন কারণে একে তরল অবস্থায়

রেখে যেতে চাইছিলাম এবং ধীরে ধীরে আইনী ও সাংবিধানিক সম্বন্ধগুলিকে বিকশিত করতে চাইছিলাম। এটি আমাদের সংবিধানে একটি অন্যরকম ব্যবস্থা। এই বিধানটি এখন আর্টিকেল ৩৭০ রূপে পার্ট ভ্জ্জ তে অস্থায়ী এবং জরুরি ভিত্তিতে রয়েছে"। ১৯৫২ সালের সাতই আগস্টে, নেহেরু আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ৩৭০ অনুচ্ছেদ চূড়ান্ত নয় এবং এটি কেবল সেই উপায়গুলিকে স্থির করে যার সাথে পরে অন্যান্য বিষয়গুলি যুক্ত করা যায়।

[Source: Jagmohan, My Frozen Turbulence in Kashmir, New Delhi: Allied Publishers, 12th Revised Edition, 2017, Chapter: XXIV - Undoing the Negative Politics of Article 370]

হাসরাত মোহনীর হস্তক্ষেপ

হাসরত মোহানী একজন মুক্তিযোদ্ধা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা নেতা এবং বিখ্যাত উর্দু কবি ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" স্লোগানটি তৈরি করেছিলেন।

১৯৪৯ সালের ১৭ই অক্টোবর এন. গোপালস্বামী আয়নগর সংবিধান সভায় অনুচ্ছেদ ৩০৬এ এর খসড়া (পরে আর্টিকেল ৩৭০ হিসাবে পুনরায় মনোনীত) প্রবর্তন করেছিলেন। এই নিবন্ধটি কাশ্মীরকে ভারতের ফেডারেল কাঠামোর একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাসরাত মোহানী কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: কেন এই বৈষম্য?

৬.১ হাসরাত মোহানীর বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি:

কেন আপনি বৈষম্য করবেন? মিঃ আয়নগর নিজেই স্বীকার করেছেন যে কাশ্মীর রাজ্যের প্রশাসন খুব ভাল পরিস্থিতিতে নেই।

আমি বিশদে যাব না, তবে আমি বলব যে এই জাতীয় বিষয়ে আমার আপত্তি রয়েছে। আপনি যদি কাশ্মীরের মহারাজাকে এই ছাড়গুলি দেন তবে বোম্বের সাথে বরোদার একত্রিকরণের বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তও প্রত্যাহার করা উচিত।

[Skipping the graphic page]

এই পদক্ষেপ জম্মু - কাশ্মীর ও লাদাখের যুবকদের মূল স্রোতে আনবে, পাশাপাশি তাদের দক্ষতা এবং প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেবে। এটি সেখানে পরিকাঠামোগত উন্নতি করবে, বাণিজ্য-শিল্পকে উৎসাহ দেবে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং পারস্পরিক দূরত্বকে মুছে ফেলবে।

- শ্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি সংগঠনের সদস্য যে কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাখতে সর্বদা সংগ্রাম করে এসেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, এটি তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই জন্য সংগ্রামে অংশ নেওয়া সকল কর্মী ও জাতীয়তাবাদী ভারতীয়কে অভিনন্দন।

- শ্রী অমিত শাহ, বিজেপির জাতীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদটি বাতিল করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি, শ্রদ্ধেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জি এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনকারী সব সংসদ সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

- শ্রী জে পি নড্ডা, বিজেপি জাতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি